রাজু নারানের কীর্তি

মনন দাস



রাজু নারাণের কীর্তি

মনন দাস



উৎসর্গ

অধ্যাপক এন. বিশ্বনাথন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১

ভোরবেলা তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি, সূর্যদেব হালকা মেঘের লেপ সরিয়ে লাল টুকটুকে মাথাটা একটুখানি বার করব করব করছেন সেইসময় দূরপাল্লার রেলগাড়ি দুন এক্সপ্রেস বর্ধমান স্টেশনে ধীর গতিতে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রান্তিক স্টেশন হাওড়া পৌঁছানর আগে এটাই এ গাড়ির শেষ থামা।

মাত্র দু-চারজন লোক নামল। একটি সাধারণ কামরা থেকে নামল সনাতন দাস। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, মাঝারি চেহারার শ্যামলা রঙের মানুষটি উচ্চতায়ও মাঝারি। পরনে ধুতি ও শার্ট দীর্ঘ রেলযাত্রায় আধ ময়লা, পায়ে পলিথিনের চটি। তার হাতে একটা নাইলনের ডোরাকাটা ব্যাগ, তার মধ্যে তার সম্পত্তি বলতে একটা ধুতি, একটা জামা আর দুটো গামছা। দুটো গামছা অনেক কাজ দেয়, যেখানে সেখানে মুক্তস্নান করা চলে, দরকার হলে একটা গামছা কোমরে জড়িয়ে আর একটি গায়ে জড়িয়ে দিব্যি ভ্রমণ করা যায়। তার ব্যাগে এছাড়া আছে একটা দু লিটারের প্লাস্টিকের জলের বোতল, একটা ছোট চিরুনি, একটা ছোট ডিবেতে একটু গুড়াকু— রোজ সকালে একটু গুড়াকু দিয়ে সে দাঁত মাজে। এছাড়া আছে একটা ছোট ভাঁজ করা ছুরি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হল তার, এ জীবনে সে দেখেছে বুঝেছে একটা ছোট ছুরি হাজারো রকমের কাজ করতে পারে। ব্যাগের মধ্যেই কাপড়ের ভাঁজে আছে কাগজে মোড়া কিছু টাকা, আর কিছু টাকা পয়সা আছে পকেটে।

একজন চেকার টিকিট দেখতে চাইলে ব্যাগ থেকে বার করে দেখাল সে, জিজ্ঞাসা করল—কুসুমপুর যাবো কোন গাড়িতে?

—ওই তো, ওই লাইনে যে লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে—ওটা যাবে।

—এই টিকিটেই যেতে পারব তো বাবু?

—হ্যাঁ, এ টিকিট তো হাওড়া পর্যন্ত। টিকিট ফেরত দিলেন চেকারবাবু।

সনাতন যাবে কুসুমপুর। ঠিক কুসুমপুর নয়, তার গন্তব্য পঞ্চসায়র গ্রাম। কুসুমপুর স্টেশনে নেমে হাঁটাপথে কুসুমপুর গ্রাম পেরিয়ে আরও দূরে পঞ্চসায়র।

কুসুমপুর স্টেশনে যখন নামল সনাতন তখন সকাল শেষ, চারিদিক রৌদ্র ঝলমল। যদিও সে কোনোদিন—কোনোদিন কেন—সাত জন্মেও কখনো এখানে আসেনি তবু একজনের কাছে শুনে শুনে সব তার মুখস্ত। একেবারে স্টেশনের টিউবওয়েল থেকে শুরু করে গেটের কাছে কলকে ফুলের গাছটি পর্যন্ত যেন কতকালের চেনা!

স্টেশনের বাইরে এসে কালীদার চায়ের দোকান দেখেই চিনে ফেলল সে, চিনে ফেলল কালীদাকেও, মনে হল কতকাল যেন ওই বেঞ্চিতে বসে চা খেয়েছে! একটু চায়ের জন্য পরানটা উসখুস করছিল, সেই সাতসকালে বর্ধমান স্টেশনে নেমেছে, নেমেই শুনল সামনের প্লাটফর্মের লোকাল ট্রেনটা এখনই ছাড়বে—দেরি না করে উঠে পড়েছিল। প্রাতঃকৃত্য এক্সপ্রেস ট্রেনেই ভোরবেলা সমাধা করেছিল, তারপর ভেবেছিল একটু চা খাবে—হয়ে ওঠেনি।

ব্যাগটা কোলের কাছে নিয়ে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে পড়ল সনাতন। আরও তিনজন বসেছিল বেঞ্চিতে, তার মধ্যে একজন চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে বলল—একটা বিস্কুট দিও কালীদা। শুনে শুনে সনাতনের মুখ দিয়েও একেবারে পুরানো পরিচিত লোকের মতো কথা বেরিয়ে এল—একটা চা দাও কালীদা।

নিত্য কত লোক কুসুমপুরের হাটে বাজারে আসছে যাচ্ছে, কালীদার দোকানে চা খাচ্ছে, তারা সবাই কালীদাকে চেনে, তা বলে কি কালীদা সবাইকে চিনে বসে আছে! কিন্তু ব্যবহারটা রাখতে হবে একেবারে আপনজনের মতো। কালীদা হাসিমুখে চিরপরিচিতের মতো বলল—একটা বিস্কুট দিই?

—দেবে? আচ্ছা দাও—বলল সনাতন।

কুসুমপুরের বাজার এ অঞ্চলের বড় গঞ্জ। আশপাশের আটদশখানা গ্রামের বড় বাজার। জনা দশবারো বড় বড় আড়তদার এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে

আমায় দেখ। তবে তার মধ্যেও বিশেষ দুচারজন আছে বইকি— যেমন শিবু পাল আর গণেশ সাঁতরা। এ সবই সনাতনের বার বার শুনে মুখস্ত। শিবু পালের আড়তে গায়েগতরে খাটবার লোক এসে কাজ চাইলে ফিরবে না, সবসময় তার এত কাজ। আর সেজন্যই অনেক লোকই টেঁকে না, এত খাটুনি। তাই শিবু পালের আড়তে গিয়ে কাজ চাইলেই পাওয়া যায়, দুবেলার খাওয়া সকালবেলার জলখাবার আছে, কিন্তু মাইনে খুবই কম।

বাজারের মাঝখানে আটচালার মেঝে সিমেন্ট বাঁধান, বৎসরান্তে অন্নপূর্ণা পূজা হয় জাঁক করে। সব আড়তদার মোটা টাকা চাঁদা দেয়। সেই আটচালার মেঝেতে সারা বছর কত লোক যে শোয়! যারা দূর থেকে সওদা করতে আসে অনেকে আড়তে টাকাপয়সা জমা দিয়ে মালপত্র গুছিয়ে আড়তে রেখে রাত্তিরটা আটচালায় ঘুমিয়ে কাটিয়ে সকালে মাঠের দীঘিতে স্নান করে—

—হ্যাঁ, ওই তো মাঠের মাঝখানে সানবাঁধানো ঘাটওয়ালা বিরাট দীঘি—দূর থেকে দেখেই চিনল সনাতন—সে শুনেছে ওই দীঘিতে চানটান করে তেলেভাজা মুড়ি খেয়ে দূরের ব্যাপারীরা মালপত্র নিয়ে গন্তব্যে ফেরার পথ ধরে। পায়ে পায়ে দীঘির ঘাটে এসে দাঁড়াল সনাতন, চানটা সেরে ফেলতে হবে।

একটা গামছা প'রে আরেকটা গামছা গায়ে দিয়ে জামাকাপড় রেশন ব্যাগে পুরে ঘাটের একেবারে শেষ ধাপে রেখে জলে নামল সনাতন, ঘাটের দিকে মুখ করে একটা ডুব দেয় আর উঠে ব্যাগ দেখে—এভাবে সাতটা ডুব দিয়ে স্নান সমাপন করল।

ধুতি পরে একটা ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে আরেকটা গামছা ভাঁজ করে মাথায় দিয়ে সনাতন এসে বসল তেলেভাজার দোকানে।

আহা! গরম গরম ফুলুরি, বেগুনি আর আলুর চপ—সাইজও বেশ বড় বড়। আর রঙ দেখ না! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়! যাই বলো তাই বলো বাপু বাঙলার মতো তেলেভাজা ভূভারতে আর কোথায় আছে! কতদিন পর এমন তেলেভাজা নজরে পড়ল? সনাতন মনে মনে হিসেব করল প্রায় পাঁচ বছর পর সে বাঙলার মাটিতে পা রাখল।

জিভ সুড়সুড়, মুখে জল, জলটা ভেতরে চালান করে সে বলল—দুটো বেগুনি আর দুটাকার মুড়ি দাও, দুটো কাঁচালঙ্কাও দিও গো।

তেলেভাজার মধ্যে বেগুনিই তার প্রিয়, অনেকদিন পর এমন বেগুনির স্বাদ! মুড়ি তেলেভাজা আর কাঁচালঙ্কা চিবুতে চিবুতে ভারী তৃপ্ত হয়ে উঠল।

দু রাত্তির ট্রেন জার্নি, তার ওপর বৈশাখ মাসের গরম। স্নান করে গামছা মাথায় দিয়ে গায়ে ভিজে গামছা জড়িয়ে কাঁচালঙ্কা সহযোগে মুড়ি তেলেভাজা! আহা, সনাতনের চোখ বুজে আসছিল আরামে! কিন্তু না, এখন অনেক হাঁটতে হবে, অনেক কিছু দেখতে হবে, তারপর ফিরে এসে না হয় হাটচালায় ঘুমানো যাবে। এর মধ্যেই রোদ্দুরের কি ঝাঁঝ! মুড়ি খেয়ে হাটতলার টিউবওয়েলে জল খেয়ে বোতলটা ভর্তি করে নিয়ে প্লাস্টিকের চটি ফটফটিয়ে বেরিয়ে পড়ল সনাতন।

বড় রাস্তা একটাই, গঞ্জ থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেছে কুসুমপুর গ্রামের দিকে, দুপাশে দোকানপাট ক্রমশ ফাঁকা হতে হতে দুপাশে চাষের মাঠ। রাস্তার দুধারে গাছপালা ভালোই আছে, ছায়ায় ছায়ায় হাঁটা যাবে। গায়ে গামছা, হাতে রেশনব্যাগ। মাথার গামছা একটু মুখের ওপর টেনে দিল সে, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল। তাকে দেখে কে বলবে সে এখানকার লোক নয়? যেন এ গাঁয়েরই লোক বাজার করে ফিরছে।

কুসুমপুর গ্রামটা বেশ বড়সড় সমৃদ্ধ গ্রাম। দোতলা সব মাটির বাড়ি, করোগেট টিনের চাল, মাঝে মাঝে একতলা দোতলা পাকা বাড়িও চোখে পড়ে। গ্রামের মাঝামাঝি এসে বিরাট চণ্ডীমণ্ডপ, দেখলে বোঝা যায় এখানে বেশ ধুমধামের সঙ্গে পুজোটুজো হয়। একটা বড় বটগাছ, গোড়াটা কিছুটা বাঁধানো, ঝুরি নেমে ডালপালা মেলে জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। অনেকক্ষণ একটানা হেঁটেছে সনাতন। গাছতলায় বসল, বোতল বার করে একটু জল খেল। ফাঁকা সুনসান জায়গাটা, মনে হয় শুয়ে পড়ি, আর শুয়ে পড়লেই একেবারে গভীর ঘুম—ভাবল সনাতন—বসলে চলবে না, দুরাত্তিরের ট্রেন জার্নির ধকল শরীর পুষিয়ে নেবে। অতএব উঠে পড়ল সনাতন।

একটু এগিয়ে বাতাসে রান্নার সুবাস। আহা, সোনা মুগের ডালে শুকনো লঙ্কা

ফোড়ন দিয়েছে গো! নাক কুঁচকে বুক ভরে সুবাস নিল সে, পেটের ভেতর ওই সামান্য মুড়ি তেলেভাজা নিরুদ্দেশে চলে গেছে। ওঃ! গরম একথালা ভাতে অমন ফোড়ন দেওয়া সুবাসিত ডাল ঢেলে দিলে সে নিমেষে উদরস্থ করে ফেলবে—দ্রুত পায়ে জায়গাটা পেরিয়ে গেল সনাতন। নাঃ! জ্বালালে! এ বাড়িটা থেকে আবার ঝিঙে পোস্তর সুগন্ধ! মনে হয় একটু পেঁয়াজ দিয়ে কষেছে। আহাহা, পেট একেবারে খাই খাই করে উঠল। আবারও তাড়াতাড়ি পা চালাল সনাতন।

কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা তো কিছু করতেই হয়। রাস্তাটা একটা বিরাট স্কুল বাড়ির পাশ দিয়ে চলেছে। কয়েকটি বড় বড় ছেলে তার সামনে গল্প করতে করতে চলেছে। দ্রুত পায়ে তাদের কাছাকাছি এসে সে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, এখানে মুদিখানা দোকান আছে?

—ওই যে, ডানদিকের গলিটায় ঢুকলে সামনেই মুদি দোকান—একটি ছেলে বলল। সনাতন গলিতে ঢুকে পড়ল।

বাঃ! দোকানে এককাঁদি কলাও ঝুলছে! চিঁড়ে, গুড় আর কলা কিনল সে। গায়ের গামছাটা শুকিয়ে গেছে, গামছার খুঁটে চিঁড়ে বেঁধে এদিক ওদিক খুঁজে রাস্তার পাশে একটা কলাগাছ দেখে ব্যাগ থেকে ছুরি বার করে আধখানা কলাপাতা কেটে নিল তারপর স্কুলের গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল।

হ্যাঁ, ওই তো টিউবওয়েল—একটি ছেলে কল টিপছিল আরেকজন জল খাচ্ছিল, সনাতনকেও কল টিপে দিল ছেলেটি। হাতে পায়ে জল দিয়ে চিঁড়ের পুঁটুলি ভালো করে ভিজিয়ে কলাপাতা ধুয়ে স্কুল চত্বরটা পর্যবেক্ষণ করতে করতে গেটের বাইরে এলো, কাছেই মাঠের মধ্যে একটা গাছ দেখে তলায় গিয়ে বসে চিঁড়ে গুড় কলা মেখে ভোজন সারল। আবার ভেতরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে দুটি গামছাই ভিজিয়ে নিয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে পুনরায় যাত্রা। কয়েকটি ছেলে কৌতুহলী হয়ে তার কাণ্ডকারখানা দেখছিল, তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করল পঞ্চসায়রের পথ। সোজা রাস্তা স্কুলের সামনে দিয়ে চলে গেছে, ছেলেরা তাকে ঐ পথ দেখিয়ে দিল।

দীর্ঘ পথের দুপাশে শুকনো ফুটিফাটা চাষের মাঠ, দূরে গাছপালা ও গ্রামের

আভাস, রৌদ্রর তীব্র ঝলকে শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে, মনটা বুঝি দমে যেতে চায়, তবু মনে জোর এনে হাঁটতে লাগল সনাতন। পা দুটো ভারী লাগছে, তবু হাঁটতেই হবে।

এই পঞ্চসায়র গ্রাম। এ গ্রামের সবকিছু তার শুনে শুনে মুখস্ত। গ্রামে পাঁচটি পুকুর, পাঁচটি পাড়া। উত্তর পাড়া, দক্ষিণ পাড়া, পশ্চিম পাড়া, পুব পাড়া ও মাঝের পাড়া। পাঁচটি বড় পুকুর মজেহেজে গেছে। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, সোজা হেঁটে মাঝের পাড়ায় চলে এলো সনাতন। ওইতো জমিদার বাড়ি, সামনে মজা পুকুরের দুধার দিয়ে দুটো রাস্তা গোল হয়ে মিশেছে গেটের কাছে, তারপর দুপাশে চলে গেছে। পুকুরের ধারে ধারে বড় বড় গাছ, একটা বকুল গাছের গুঁড়ির আড়ালে বসল সনাতন, নজর করে দেখতে লাগল জমিদার বাড়ি।

বিরাট গেটের ওপরে সামনের এক থাবা তুলে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সিংহের হাঁ-করা চোয়াল ভেঙে চলে গেছে, দুপাল্লা লোহার ফটকের কতগুলি রেলিং ভাঙা, দুটো পাল্লা কয়েকটা রড নিয়ে অর্ধ বন্ধ অবস্থায় নিচের দিকটা মাটিতে পুঁতে গেছে, সেখানে জন্মেছে আগাছা। বাউণ্ডারি পাঁচিলে জায়গায় জায়গায় ভাঙা। ফটকে না ঢুকেও ওইসব ভাঙা অংশ দিয়ে দিব্যি যাতায়াত করা যেতে পারে। ডানদিকে একটি মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে—ওদিকে তাকিয়ে সনাতনের বুকটা ধ্বক করে উঠল।

উঠে দাঁড়াল সনাতন, জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে মন্থর পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় সনাতন দেখল গেটের ভিতর একটা পায়ে চলা পথ চলে গেছে বাড়ির দিকে, আরেকটা গেছে মন্দিরের দিকে। সে শুনেছে সারাদিন গ্রামের অনেকেই আসা যাওয়ার পথে ভেতরে ঢুকে মন্দিরে প্রণাম করে যায়। একটু ইতস্তত করে সে ঢুকেই পড়ল। নিজেকে খুব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছিল সনাতন, তবু তার বুক থেকে পা যেন কেঁপে উঠছিল। মন্দিরের কাছে গিয়ে কধাপ সিঁড়ি ভেঙে চত্বরে উঠতে হয়। চটি খুলে সেটুকু উঠতে পেরে উঠছিল না, কোনোক্রমে উঠে সে চত্বরে বসে পড়ল, এদিক ওদিক তাকাল—কেউ কি দেখছে তাকে? কে জানে! কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। ওই অবস্থায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল

সনাতন, তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে দেখল দেবীমূর্তির বেদীর দিকে। গর্ভগৃহে আধো অন্ধকার, তবু দেখা যায় ওইখানে চৌকো মতো কি যেন একটা রয়েছে। বুকটা ধ্বক ধ্বক করে উঠল সনাতনের, তাড়াতাড়ি উঠে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখন পুরোহিত মশাই নামাবলী গায়ে উঠে আসছেন। বুকটা আবারও এমন ধ্বক ধ্বক করে উঠল সনাতনের যেন এখনই ওকে ধরে বেঁধে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড করবে। দ্রুতপদে গেটের বাইরে এসে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে চলল পশ্চিমের রাস্তা ধরে।

ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছে ঘরবাড়ি, শেষ দু একটা বাড়ির পিছনে শুরু হয়েছে ঝোপঝাড় জঙ্গল, জঙ্গলের পাশ দিয়ে রাস্তা ঘুরে গেছে দক্ষিণ পাড়ার দিকে। একটু দাঁড়াল সনাতন, দেখল একটা সরু পায়ে চলা পথ চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। শেষ বাড়িটার পিছনে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে জায়গাটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করল। ওদিক থেকে এগিয়ে আসছেন এক ভদ্রলোক। গামছাটায় মুখ মোছার ভান করে মুখটা আড়াল করতে চাইল। এমন সময় তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের চিৎকার—ওরে মুখপোড়া বাঁদর, আবার আম গাছে উঠেছিস?

হকচকিয়ে গেল সনাতন, আর ঠিক তখন গাছ থেকে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল একটা বাঁদর—না, আল্‌গা গা, হাফপ্যান্ট পরা একটা ছেলে। দুজনে দুজনকে ধরে মুখোমুখি, হঠাৎ ছেলেটা ওকে ঠেলে দে দৌড়। ধুতি আর খদ্দরের পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক ততক্ষণে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, সনাতন তাঁকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে ফিরে চলল, গামছাটা টেনে দিল মুখে।

জঙ্গলের ওই সরু পথের শেষে ভেতরে কোথায় লুকিয়ে আছে সেই পোড়ো ভিটে কে জানে—ভাবল সনাতন। দেখাশোনা তো হল যাহোক, এবার ফিরতে হবে। হ্যাঁ কুসুমপুরের বাজারই থাকবার পক্ষে ভালো জায়গা, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে যে ভাবেই হোক।

সূর্য মধ্যগগন থেকে কিছুটা হেলেছে, বেলা দেড়টা দুটো হবে বোধহয়—ভাবতে ভাবতে দ্রুত হাঁটতে থাকল সনাতন—কেউ তেমনভাবে লক্ষ্য করেনি, আর এখন তো এই আগুনঝরা রোদ্দুরে রাস্তায় কেউই নেই। হঠাৎ আমগাছ থেকে লাফিয়ে

ঘাড়ে পড়ল ছেলেটা, কিন্তু ওকি ভালো করে দেখেছে?

জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে ফেরার সময় ভাঙা পাঁচিলটাচিল, বাড়ির আগাপাশতলা, মন্দিরের পথ ইত্যাদি যতটা ভালো করে দেখা যায় দেখে নিল সে। এ গ্রামে ঘাঁটি গাড়বার কোনো জায়গা নেই, অথচ ওখানে কুসুমপুরের বাজারে হাজারটা বাইরের লোকের আসা যাওয়া, ভাবল সে—দূরে থেকেই কাজ সারতে হবে, দূরেই থাকা ভালো।

একটু দাঁড়িয়ে বোতল বার করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে নিল সে তারপর দ্রুত পা চালাল কুসুমপুরের দিকে।

ফিরতে ফিরতে বিকেল। হাটতলার পুকুরঘাটে বসে এতক্ষণে পা দুটো বিশ্রাম পেল। শরীর এলিয়ে পড়ছে। কাপড় ছেড়ে গামছা পরল সনাতন। সকালের প্রথাতেই সাতটা ডুব দিয়ে স্নান করল। জামাকাপড় পরে গামছা দুটো শুকোতে দিল দড়িতে। দুটো গাছে লম্বা লম্বা দড়ি টাঙিয়ে রেখেছে হয়তো হাটেরই উটকো বাসিন্দারা।

কয়েকজন মুটে মজুর মতো লোক এসে হুড়মুড়িয়ে নামল পুকুরে, বোধহয় দিনের কাজ শেষ করে স্নান করতে এসেছে।

ঘাটের ওপর চাতালে হেলান দিয়ে বসার জন্য বাঁধানো জায়গা, আরাম করে বসল সনাতন। অনেকক্ষণ বসে রইল। অন্ধকার নামল।

তন্দ্রামতো এসেছিল, ভাত ফোটার গন্ধে তন্দ্রা ছুটল। ওঃ! তিনদিন হতে চলল ভাত পড়েনি পেটে। ওইরে! পেট যেন তেপান্তরের মাঠ! তেলেভাজার দোকানের পাশে ভাতের হোটেল দেখেছিল যেন? উঠে গামছা ভাঁজ করে ব্যাগে পুরল সনাতন।

ফ্যান মেশানো ডাল আর আলুভাতে দিয়ে একথালা ভাত নিমেষে উড়িয়ে দিয়ে পেটের মধ্যে তেপান্তরের মাঠটা একটু ছোট করে আনার পর আরেক থালা ভাত নিয়ে তরকারি চাইল সে, আহাহা ঝিঙে আলুপোস্ত যে গো! পেঁয়াজ দিয়ে বেড়ে রেঁধেছে। দুপুরবেলার অপূর্ণ সাধটা মা অন্নপূর্ণা যেন মন বুঝে পূরণ করে দিল গো! চোখ বুজে তারিয়ে তারিয়ে আরেক থালা ভাত খেতে লাগল সনাতন।

—মাছ? না না, মাছ লাগবে না, বরং আর দুটো ভাত দাও ভাই।

বছর পাঁচেক হল মাছ খাওয়া ছাড়তে হয়েছে, এমনকি পেঁয়াজও। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধা হত, এখন বরং উলটো, মাছ মাংস ডিমের গন্ধও সহ্য হয় না। এ একরকম ভালোই হয়েছে, একটুকরো মাছে আর পেটের কতটুকু ভর্তি হয়! অথচ দাম একগাদা। ওই দামে এত্তোটা ভাত হয়ে যায়। তবে কি না পেঁয়াজ পোস্তর ব্যাপারটা আলাদা, বহুদিন পর এমন তারের তরকারি পেয়ে তারিয়ে তারিয়ে আরেক থালা ভাত খেয়ে নিল সে।

তারপর মা অন্নপূর্ণার থানে শানবাঁধানো মেঝেতে শুধু একটা গামছা পেতে নিয়ে ব্যাগ মাথায় দিয়ে শয়ন আর ঘুমের জগতে গমন।

পরের দিন ধীরে সুস্থে বাজারটা ভালো করে ঘুরে ঘুরে দেখল সনাতন। চাল, ডাল, তেল, গুড়, মশলা—কত রকমের আড়ত আর কিরকম সব বাহারে গন্ধ ! গমগম করছে লোকজনে, গোছা গোছা টাকা লেনদেন হচ্ছে। শিবু পালের আড়তের কথা শোনাই ছিল, জিজ্ঞাসা করে সেটা খুঁজে নিয়ে একটু তফাত থেকে নজর করতে লাগল। এখানে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে ভালোই হয়। একটা আশ্রয়ে থিতু হয়ে বসে চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনা করা যেতে পারে। গত মাসখানেক ধরে যতটুকু পরিকল্পনা করা হয়েছিল এসে পর্যন্ত তা ঠিকঠাক এগিয়েছে, এবার আসল কাজ। দেরী না করে আজ রাত্তিরেই বড় কাজটা সেরে ফেলতে হবে, তারপর থিতু হয়ে বসা। সারারাত ভালো ঘুমের পরে শরীরে আবার তাকত ফিরে এসেছে।

দুপুরে খেয়েদেয়ে আরেকটা ঘুম দিল সনাতন পুকুরপাড়ের গাছতলায় শুয়ে। বিকেলবেলা শরীরে যেন রেসের ঘোড়ার শক্তি। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনাগুলো সাজাতে লাগল সনাতন।

বাজারে চারজন পালোয়ান পাহারাদার আছে দেখা গেল। রাত্তিরবেলা বাজার চত্বরে কিছুদূর অন্তর অন্তর ইলেকট্রিক আলো জ্বালানো থাকে, পাহারাদাররা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। অতএব আজ রাত্তিরে অন্নপূর্ণার থানে শোয়া চলবে না। মাঝরাত্তিরে উঠে যাত্রা শুরু করলে পাহারাদারদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা। অতএব আজ পুকুরঘাটের এই বাঁধানো বেঞ্চে শুতে হবে, আর ঘুমিয়ে সকাল করলে চলবে না।

মাঝ রাত্তিতে উঠে পড়ল সনাতন। চারিদিক কি সুনসান। একটু দূরে বাজার চত্বরের বিচ্ছিন্ন আলো ছাড়া অন্ধকারের সমুদ্দুরে ডুবে আছে পৃথিবী। ধুতিটা একটু খাটো করে হাঁটুর ওপর তুলে নিল, জামাটা গায়ে দিয়ে নিল তারপর চটি পরে ব্যাগ হাতে নেমে পড়ল অন্ধকারে। একবার যা দেখে নিয়েছে রাস্তাঘাট ও আর ভুল হবার নয়। সাঁই সাঁই করে হাঁটতে লাগল সনাতন। একসময় মধ্য রাত্রের এরকম অভিযান তার জলভাত ছিল, কিন্তু বহুদিন ওসব থেকে দূরে সে, আজ অনেকদিন পর তার বুকে পুরনো উত্তেজনা। আসলে চুরিচামারি করে শুধু হাত নোংরা আর বদনাম হয়, পেট ভরে না। কিন্তু কোনো মায়ের ব্যাটা বলতে পারবে সনাতন ধরা পড়েছে? ওই সন্দেহ আর সন্দেহ—ওই পর্যন্তই! হুঁ! নিজেকে নিজেই প্রশংসা করল সনাতন।

স্কুলবাড়ির কাছে এসে একেবারে থামল সে। গতকাল চিঁড়ে ফলার করার সময় চারপাশটা ভালো করে দেখে নিয়েছে। নিচু পাঁচিল টপকে বাউণ্ডারির ভেতর চলে এল সে। পাঁচিলের পাশে একটা ঝোপের মধ্যে ব্যাগটা ও চটিটা লুকিয়ে রাখল, তারপর আবার পাঁচিল ডিঙিয়ে রাস্তায়।

জমিদার বাড়ির রুটিন তার শুনে শুনে মুখস্ত।

ভোর চারটেয় পুরুতমশাই এসে মন্দিরের তালা খোলেন, একটি আশ্রিত ছেলে আছে কাজকর্ম করে—সে এসে ঘণ্টা বাজায়, ঠাকুরমশায় আরতি করেন, তারপর দুজনেই চলে যায়। মন্দির তারপর খোলাই থাকে। সকালে বাল্য ভোগ, তারপর দুপুরে ভোগ নিবেদন করে দেবতার বিশ্রামের জন্য দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় কিন্তু তালা দেওয়া হয় না। বৈকালে পুনরায় দরজা খুলে বৈকালী দেওয়া হয়, তারপর দরজা খোলাই থাকে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, রাত্রে ভোগ নিবেদনের পর ঠাকুরমশায় তালা দিয়ে চলে যান।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সনাতন ঠিক সময় ভাঙা পাঁচিলের পাশে এসে দাঁড়াল। চারিদিকে ভালোই অন্ধকার।

একটু পরেই পুরোহিত মশাই ঢুকলেন, তারও একটু পরে ঘণ্টার আওয়াজে বোঝা গেল মঙ্গল আরতি শুরু হয়েছে।

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কিন্তু হঠাৎ এ সময় তিনচারজন লোক হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উদয় হবে এটা হিসাবে ছিল না সনাতনের, তবু সত্বর সে একটু পিছিয়ে পাঁচিলের গায়ে মিশে যেতে চাইল। ওরা কথা বলতে বলতে চলে গেল, দুর্ঘটনা কিছু ঘটল না। পুরোহিত মশাই যথারীতি চলে গেলেন, আরও একটু অপেক্ষা—এতক্ষণে ছেলেটা নিশ্চয় ঘরে ঢুকে গেছে, সন্তর্পণে শিকারী বেড়ালের মতো ভেতরে প্রবেশ করল সনাতন। মন্দিরের একটু তফাতে পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিক দেখতে লাগল। অতঃপর নিশ্চিন্ত হয়ে ত্বড়িৎ গতিতে মন্দিরে উঠে ভেতরে প্রবেশ করল ও চকিতে দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বেদী থেকে চৌকো তাম্রফলকটি তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পথে। ইতিমধ্যে ওটা পেট কাপড়ে গোঁজা হয়ে গেছে। হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল সনাতন।

অবশ্য ধরা পড়লে কি বলবে সে গল্প সাজিয়ে রেখেছিল মনে মনে। একেবারে গৃহকর্তার সামনে এমন গল্প ফাঁদত!

স্কুল বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে ব্যাগটা নিয়ে চটি পায়ে গলিয়ে যখন পুনরায় পথে তখন বেশ ফরসা হয়ে গেছে। একটা নিমগাছ দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করতে করতে এমন নিশ্চিন্তে চলতে লাগল সনাতন দেখলে মনে হবে বুঝি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন, বাজার করে ফিরবেন।



২

রাজু আজ প্রথম স্কুলে যাবে। পাশের গ্রামে কুসুমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য দাদু তাকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাবেন। গতকাল রাতে তার ভালো ঘুম হয়নি, সারাক্ষণ কেমন একটা উত্তেজনা বুকের মধ্যে পাক দিচ্ছিল আর অস্থির করছিল। খুব ভোর ভোর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে সে।

দোতলায় তার শোবার ঘরে বিছানার মাথার কাছে বিরাট জানালা। জানালাটা যদিও রোজই শোবার সময় খোলা থাকে কিন্তু সকালে উঠে রোজই সে দেখে ওটা বন্ধ। বড় খাটটিতে সে আর ঠাকুমা শোয়। ঠাকুমা রাত্রে কখন জানালাটা বন্ধ করে দেন। একদিন রাজু জিজ্ঞাসা করেছিল—ও ঠাকুমা রোজ রাত্রে জানালাটা বন্ধ করে দাও কেন? তোমার কি ভয় লাগে?

—হ্যাঁ, রাতের বেলা পরীরা উড়ে এসে যদি আমার রাজুকে তুলে নিয়ে যায়?

—তাহলে তো খুব ভালো হয়, কোন অজানা দেশে নিয়ে যাবে।

—বা রে, আমার জন্য তোর মন কেমন করবে না?

—ওসব পরীটরী ভুতটুত কিচ্ছু নেই, দাদু বলেছে, বলো না কেন জানালা বন্ধ করো?

—মাঠের অতো হাওয়ায় শরীর খারাপ করবে, খড়খড়ি খোলাই থাকে, ওই যথেষ্ট, ঠাকুমা বলেছিলেন।

সকালে উঠেই কিন্তু সে রোজ জানলা খুলে দেয়। চারপাশ দেখে, দূরের মাঠ দেখে, কেমন হু হু হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদিকটা পূর্বদিক, সূর্যোদয় দেখা যায়, আর দেখা যায় বিশাল আকাশে রাঙা রঙের খেলা। পূবের আকাশ যেন রাঙা রঙের নদী। দাদু বলেছেন সূর্যই সকল শক্তির উৎস, সূর্যের জন্যই পৃথিবীতে বেঁচে আছে উদ্ভিদ আর প্রাণী, যদি সূর্য নিভে যায় সব শেষ হয়ে যাবে, তাই সূর্যকে প্রণাম করবে শক্তির আধার জেনে।

অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। ঠাকুমা উমারানী আজ বড় ব্যস্ত। পুঁটির মাকে অন্তত দশবার বলেছেন তাড়াতাড়ি রান্না করে দিতে। পুরুতমশাইকে অন্তত পাঁচবার বলেছেন ঠাকুরের চরণের ফুল এনে দিতে। তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে রাজু যখন জামাপ্যান্ট পরছে আর ঠাকুমা চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন তখন পুরুতমশাই নিত্যানন্দ হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

—বড় দেরী করে ফেললেন ঠাকুরমশায়—ঠাকুমা বললেন—ইচ্ছা ছিল স্নান করা হলেই রাজুর মাথায় ফুলটা ছোঁয়াব, তা আর হল না, দিন, ওর মাথায় ফুলটা ছুঁইয়ে বুক পকেটে দিয়ে দিন, কি আর করা যাবে! কিন্তু আজকেই এত দেরী হল কেন? পুজো তো কোন সকালে হয়ে যায়।

—একটা খুব খারাপ খবর আছে বড় মা, কি করে যে বলি—পুরুতমশায় মুখ কাচুমাচু করে বললেন।

—কি আবার খারাপ খবর? ও থাক, সে কথা পরে শুনব, এখন যা বলছি করে ফেলুন।

—না, না, পরে শুনবার নয়, ঠাকুরের বেদীতে তামার যে মঙ্গলপত্র ছিল, সেটা দেখতে পাচ্ছি না।

—ওটা আবার কোথায় যাবে? দেখুন ফুলে ঢাকা পড়ে আছে।

—না, না, আমি অনেক করে খুঁজেছি। রোজ ওতে চন্দনের ফোঁটা দিই, আজ দেখি নেই, অনেক খুঁজলাম—ঠাকুরমশায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন।

এই মঙ্গলপত্র বা মঙ্গলপাঞ্জাটি হচ্ছে হাতের পাতার মতো বড় তামার একটি চৌকো ফলক যার মধ্যে খোদাই করা আছে নানা মঙ্গল চিহ্ন, সঙ্গে এককোণে খোদাই করা আছে পাঁচ আঙুলসমেত একটি হাতের তালু বা পাঞ্জা। ওটা মন্দিরে বিগ্রহের বেদীতে রাখা থাকে। কতকাল ধরে যে ওটা ওখানে রাখা আছে রাজুর ঠাকুরদা ইন্দ্রনাথও জানেন না। তিনিও ছোটবেলা থেকে ওটা দেখছেন। ওটা এ বংশের নাকি মঙ্গলকারক।

ইতিমধ্যে ইন্দ্রনাথ তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছেন, তাঁকে দেখে উমারানী হায় হায় করে উঠলেন—শুনেছ? কি অলুক্ষুণে কথা! তিনপুরুষের মঙ্গলপত্র সেটা

নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। আজ প্রথম রাজু আমার ইস্কুলে যাবে, আর আজই কি না ওটা হারাল? আজ ইস্কুলে নিশ্চয়ই পরীক্ষা ভালো হবে না। তুমি বরং অন্য একটা শুভদিন দেখে—

—নাও কথা! ওটা হারানোর সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার ভালোমন্দ জড়াচ্ছ কেন? কাল যদি তুমি স্কুলে যাওয়ার সময় হেঁচে ফেল, বলবে—স্কুলে যেতে হবে না? পরশু যদি বিশুর সাইকেলের চাকা লিক্ হয়ে যায়, বলবে—বাধা পড়েছে? যত সব কুসংস্কার।

—তাই বলে এতবড় একটা অমঙ্গল—

—এরকম কত ঘটনা তো সবসময় ঘটছে, তাতে জগৎসংসার কি থেমে থাকছে? এইভাবে হাজার কুসংস্কারে নিজের ছেলেটাকে ডুবিয়ে রেখেছিলে—

কথাটা অর্ধপথেই থামিয়ে ফেললেন ইন্দ্রনাথ, উমারানীর মুখ ব্যাথাতুর হয়ে উঠেছে, ঠোঁটের কোণ কাঁপছে কান্নায়। এই বিষয়টা কখনই তুলতে চান না, অথচ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রাজুর হাত ধরে বললেন—চলো দাদুভাই।

স্ত্রীকে বললেন—ওটা আছে কোথাও, চিন্তা কোরো না।

ঠাকুরমশায়কে বললেন—আপনি ভালো করে খুঁজে দেখুন, কোথায় আর যাবে? ঠাকুরের গয়নাগাটি? সেসব?

—সেসব ঠিক আছে, মুকুট, বালা, হার—সব ঠিক আছে।

—তবে? দামী জিনিস ছেড়ে কে আর ওই সামান্য তামার পাতটা নিতে যাবে?

দুজনে নিচে নেমে এলেন। বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে নায়েবমশাই হরিচরণ আর এ বাড়ির সবসময়ের কাজের লোক বিশু। নায়েবমশাই বয়সে ইন্দ্রনাথের চেয়ে কিছু ছোট, এ গ্রামেই পশ্চিমপাড়ায় তার বাড়ি। অনেক কাল এ বাড়ির নায়েবী করেছেন। অবশ্য এখন আর জমিদারী নেই, নামেই জমিদার বাড়ি। তবুও যতটুকু জমিজমা পুকুর বাগান অবশিষ্ট আছে সেটুকু উনিই দেখাশোনা করেন। এ বাড়ির ভালোমন্দ সবকিছুর সঙ্গে মিলে মিশে যেন এ বাড়িরই একজন মানুষ হয়ে গেছেন।

রাজুর ভালো নাম রাজেন্দ্রনাথ। এ নাম রেখেছেন ইন্দ্রনাথ। বংশলতিকায় ইন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তাঁর প্রপিতামহের নাম ছিল রাজেন্দ্রনাথ। শুনেছিলেন এ বংশে তিনিই ছিলেন পুরুষসিংহ। তাঁর আমলেই জমিদারীর শ্রী শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখন পড়তি অবস্থায় তিনি নাতির নাম তাঁর প্রপিতামহের নামেই রেখেছেন, হয়তো মনে মনে বিশ্বাস—নাতি আবার এই বংশের মুখ উজ্বল করবে।

অক্ষর পরিচয় থেকে শুরু করে এতদিন পর্যন্ত নাতির শিক্ষার দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করেছেন। পাঠক্রম অনুযায়ী বইপত্র যোগাড় করে এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই এনে নাতিকে যথেষ্ট তৈরি করতে পেরেছেন, কিন্তু এবার আর স্কুলে না ভর্তি করলে চলবে না, প্রথাগত শিক্ষার জন্য, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এসব পরীক্ষার দিকে এগিয়ে যেতে হলে স্কুলে ভর্তি করতেই হবে।

রাজুদের গ্রামের নাম পঞ্চসায়র, পাশের গ্রাম কুসুমপুর। পঞ্চসায়র গ্রামে কোনো স্কুল নেই বললেই হয়। সামান্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে বটে কিন্তু সেখানে ছাত্রসংখ্যা নগণ্য। এ গ্রামের বেশিরভাগ ছেলেকেই কুসুমপুরের স্কুলে ভর্তি করতে চান অভিভাবকেরা। হাঁটাপথে দূরত্ব আধঘণ্টার মতো। ঠিক হয়েছে বিশু রোজ সাইকেলে করে রাজুকে দিয়ে ও নিয়ে আসবে।

বিশুর তিনকূলে কেউ নেই। কবে কোন ছোটবেলায় সে এ বাড়িতে এসে আশ্রয় পেয়েছিল সে কথা আজ আর কারো মনে নেই। এখন বিশুর বয়স বছর পঁচিশ। এ সংসারের জন্য যেমন পরিশ্রম করে তেমনই দাবিও তার যথেষ্ট। যেন সে এ পরিবারেরই একজন। খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে পোষাক আশাক সবেতেই তার চাওয়াটা দাবির পর্যায়ে। সম্প্রতি তার দাবি ছিল সাইকেলের, তা ইন্দ্রনাথ তাকে কিনে দিয়েছেন। সাইকেল এখন বোধহয় বিশুর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। দিনের মধ্যে কতবার যে মোছা হয়! নায়েবমশাই বলেন—ও বিশু, অত মুছলে যে পালিশ চটে রঙ উঠে যাবে!

—কি যে বলেন নায়েব কাকা, এ কি আমি গরু চান করাবার মতো ঘসঘসিয়ে মুছি? নরম কাপড় দিয়ে আলতো করে মুছি —বলে একটা ছেঁড়া মখমলের কাপড়ের টুকরো দেখায়, সম্ভবত বালিশের বাতিল ওয়াড়।

বাইরে একটা ছইওলা গরুর গাড়ি দেখা যাচ্ছিল, ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন নায়েব মশায়ের দিকে, বললেন—ওটা কি?

—ওটা ঝাড়পোঁছ করে দেওয়া হয়েছে বড়কত্তা, বৈশাখ মাসের এই রোদ্দুরে এতটা পথ যাবেন, রাজুরও কষ্ট হবে, তাই বিশুকে বললুম।

—বলদ দুটো খুব শান্ত কত্তাবাবা—বলল বিশু—কিচ্ছু ভেবো না, আমি ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাব।

—আমি তো ভেবেছিলাম এটা মাথায় দিয়েই হেঁটে যাব—হাতের ছাতাটা নেড়েচেড়ে বললেন ইন্দ্রনাথ।

—হ্যাঁ, হেঁটে গেলে কেমন চারিদিক দেখতে দেখতে যাওয়া যেত— বলল রাজু, এই প্রথম সে এতখানি পথ হাঁটার সুযোগ পেয়েছিল, সেটা ভেস্তে যাচ্ছে, ওই ছইয়ের মধ্যে গুটিসুটি বসে যাওয়া, কিছুই দেখা যাবে না।

—দেখার আবার কি আছে?—অবাক হয়ে বলল বিশু—এই মাঠঘাট আর গাছপালা, এ কি কলকাতা শহর, যে কত রকমের গাড়ি বাড়ি আরও সব কত কি দেখবে!

—ওঃ! কত যেন কলকাতা চষে বেড়িয়েছে বিশু!—নায়েবমশাই বললেন।
—ঠাকুরমশায় কি যেন বলছিলেন, শুনেছেন? —বললেন ইন্দ্রনাথ।

—ঠাকুরমশায়? কই নাতো। আমার সঙ্গে আজ দেখাও হয়নি—অবাক হয়ে বললেন নায়েবমশায়।

—উনি ওপরে আছেন, এখনি নেমে আসবেন, আপনি একটু জিজ্ঞাসা করে দেখুন, মন্দির থেকে কি যেন হারিয়ে গেছে।

কুসুমপুর উচ্চ বিদ্যালয় বেশ বড়ই। অনেকটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ফটকের ওপর অর্ধবৃত্তাকার লেখা। রাজু বসেছে গরুর গাড়ির ছইয়ের সামনের দিকে, দূর থেকে বিরাট দোতলা স্কুলবাড়ি, তার সীমানা, ফটক ইত্যাদি দেখতে দেখতে তার বুক দুরু দুরু করে উঠল।

—এখানেই দাঁড়া বিশু, গাড়ি হাঁকিয়ে আর ভেতরে যাসনি—ইন্দ্রনাথ বললেন,

আমরা এটুকু হেঁটেই যাব, দেখলে কে না কি ভাববে।

—বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখনো রেজাল্ট বেরোয়নি, বোধহয় তাই স্কুল চত্বর ফাঁকা—বললেন ইন্দ্রনাথ—কমবয়সী ছেলেদের দেখাই যাচ্ছে না।

কয়েকটি পনেরো ষোল বছর বয়সী ছেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, সম্ভবত মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের ছেলেরা। রাজুর হাত ধরে ইন্দ্রনাথ বাঁদিকের শেষ ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—কারো অফিসঘরে প্রবেশ করার আগে নিয়ম হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা ও অনুমতি নেওয়া—নিম্ন স্বরে বললেন ইন্দ্রনাথ, একটু উঁচু গলায় বললেন—ভেতরে আসতে পারি?

দরজার ওপর নিচ ফাঁকা, শুধু মাঝখানে দুটো ছোট ছোট পাল্লা বন্ধ হয়ে রয়েছে, এমন দরজার পাল্লা রাজু কখনও দেখেনি। দরজার মাথায় একটা ফলকে লেখা—'প্রধান শিক্ষক।'

—আসুন—ভেতর থেকে শোনা গেল আহ্বান।

পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকল দুজন, অবাক হয়ে দেখল রাজু পাল্লা দুটি আপনিই বন্ধ হয়ে গেল।

একটা বড় টেবিলের ওপারে বসে চশমাপরা হালকা চেহারার ভদ্রলোক, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আসুন আসুন কাকাবাবু।

—এই আমার নাতি, নরেনের ছেলে, একে ভর্তির কথাই তোমাকে বলেছিলাম, রাজু, ইনি হেড মাস্টারমশাই, ওঁকে প্রণাম কর।

টেবিলের সামনে তিনটি চেয়ার, ওদিকে উনি, রাজু ঘুরে ওদিকে যেতে চাইলে উনি বললেন—থাক থাক, আপনি বসুন, তুমিও বোসো।

—না, না, সমীরণ, আজ ও প্রথম স্কুলে এল, প্রণাম না করলে হয়? যাও রাজু।

রাজু এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল, তারপর ফিরে এসে দাদুকেও প্রণাম করল। ঠাকুমা শিখিয়েছেন একজনকে প্রণাম করলে উপস্থিত সকল বড় জনকেই প্রণাম করা রীতি।

ছবিসহ মনীষীদের জীবনীর বই রাজু পড়েছে, সেখানে স্যার আশুতোষের ছবি ও পরিচয় আছে, হেড মাস্টারমশাইর নামটার সঙ্গে রাজুর তাই মনে ভেসে ওঠে স্যার আশুতোষের ছবি, অমনই গম্ভীর আর ভারিক্কি চেহারার মানুষ নিশ্চয় হবেন হেডমাস্টারমশাই। এ ঘরের দেওয়ালে অনেকের ছবি—বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, নেতাজী, মহাত্মা গান্ধী—আরও অনেকের, তাঁদের সঙ্গে স্যার আশুতোষের ছবিও রয়েছে, সে ছবিটি আবার ঠিক হেড স্যারের মাথার ওপর, কিন্তু ওনার চেহারার সঙ্গে স্যার আশুতোষের সামান্য মিলও নেই। হেড স্যারের চেহারা ছিপছিপে, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা আর সরু গোঁফ। স্যার আশুতোষের ছবি আর হেড স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ফিক করে হেসে ফেলল এবং পরক্ষণে ভয় পেয়ে গেল, যদিও উনি দেখেননি বুঝে স্বস্তি পেল রাজু।

—তোমার নাম কি?—সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন স্যার।

—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়—বলল রাজু।

—জানো সমীরণ, এই নাম ছিল আমার প্রপিতামহের, তিনিই আমাদের বংশের কীর্তিমান পুরুষ,রাজেন্দ্র আবার এই বংশের কীর্তি স্থাপন করবে এই আশা আর কি! এই বুড়ো মানুষটা ঐ আশা নিয়েই বেঁচে আছে—বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ইন্দ্রনাথের বুক থেকে।

—নরেনের আর কোনো খবরই পাওয়া গেল না?—স্যার জিজ্ঞাসা করলেন।

—যে নিজেই নিজেকে আড়ালে রেখেছে তাকে কী করে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? আগে মাঝে মাঝে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতাম, এখন আর দিই না। আর কী বা আমি করতে পারি!

রাজু বুঝতে পারছিল দাদুর খুব কষ্ট হচ্ছে। তারও বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট ঠেলে উঠছিল। সব কথা সে ঠিক জানে না বা বোঝে না। বাবা মা তার কাছে ছবিমাত্র। তার ঘরে বাবা মায়ের দুটো বাঁধানো ফটো আছে। সে জানে বাবার নাম নরেন্দ্রনাথ আর মায়ের নাম কনকলতা। আর জানে সে জন্মানোর সময় তার মা মারা গেছেন, আর বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন কোথায় কেউ জানে না। জন্ম হওয়াই বা কি, বাবা মা কেমন হয় এসব সম্পর্কে তার বোধ ভাসা ভাসা। জ্ঞান হয়ে

পর্যন্ত সে দাদু ঠাকুমার স্নেহেই বড় হয়েছে, মা বাবার অভাব বোধ সে বোঝেই না। সমবয়সী বন্ধু তার নেই। থাকলে, তাদের পরিবারে মেলামেশা করলে কিছুটা অনুভব করতে পারতো। বাড়ির গণ্ডি, বাগান, পুকুর, মন্দির আর বাড়ির কয়েকটি মাত্র মানুষ—এদের মাঝেই তার জগত।

ইংরাজি, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান, সবকিছুরই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন স্যার, রাজু সব উত্তর দিল নির্বিঘ্নে। স্যার খুব বাহবা দিচ্ছিলেন, একবার ইন্দ্রনাথকে বললেনও—আপনার হাতে মানুষ, এমন তো হবেই। অঙ্ক কষতে দিলে পঞ্চম শ্রেণির বেশ কয়েকটি শক্ত অঙ্ক ভালোভাবেই করে দিল রাজু, ষষ্ঠ শ্রেণির প্রথমদিকের কিছু জ্যামিতি এবং পাটিগণিতও।

—হ্যাঁ, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত—বললেন স্যার।

স্যারকে আবার প্রণাম করল রাজু, উনি রাজুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এত ভালো লাগল রাজুর!

বৈশাখের খর রৌদ্রে উত্তপ্ত চরাচর। শূণ্য মাঠে উড়ছে ধুলোর ঘূর্ণি। বৃক্ষসকল রৌদ্র পান করছে নিঃশব্দে। ফিরে চলেছে গরুর গাড়ি। ইন্দ্রনাথ রাজুকে বুকের কাছটিতে টেনে নিয়ে বসেছেন। দীর্ঘশ্বাসে বুক ভরে নিয়ে বললেন—রাজু, আজ আমার বড় আনন্দের দিন, তুমি আজ আমার মুখ উজ্বল করেছ, আমার এতদিনের পরিশ্রম সার্থক। চেষ্টা কোরো এই সফলতা যেন সারা জীবন ধরে রাখতে পার।

একটুক্ষণ চুপচাপ, তারপর বললেন, দেখলে তো তোমার ঠাকুমা মিথ্যে ভয় করছিল। কোথায় কি ঘটল তার জন্য বাধা পড়ল—ওসব কুসংস্কার। জীবনে কুসংস্কারকে একেবারেই প্রশ্রয় দেবে না।

—রাজুদাদাকে কবে থেকে ইস্কুলে আনতে হবে কত্তাবাবা? বিশু জিজ্ঞাসা করল।

—এখনও দিন দশেক দেরী আছে—বললেন ইন্দ্রনাথ।

—আমাকে কিন্তু একটা ফুল প্যান্টালুন কিনে দিতে হবে, আর একটা

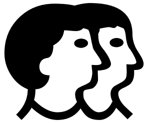
ডোরাকাটা গেঞ্জি, রাজুদাদাকে সাইকেলে নিয়ে আসব ভালো 'ডেরেস না' হলে হয়!

—আচ্ছা আচ্ছা, সে হবেখন।

—না না, কালকেই টাকা দেবে, আমি কুসুমপুরের হাট থেকে কিনে আনব।

—ওঃ! তোর আর তর সইছে না!—প্রাণখোলা হাসি হাসলেন ইন্দ্রনাথ।





৩

গগন যখন মাছ ধরতে বেরোয় তখন অন্ধকার রাত। যদিও লোকে বলে ভোর চারটে, কিন্তু তখন কিছুই আলো ফোটে না। কিন্তু তখন বাড়ির পিছনের জাম গাছটায় একটা বুলবুলি পাখি রোজ ডাকাডাকি করে আর গগনও উঠে পড়ে। তাদের ঘরে তো আর ঘড়ি নেই!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে আরও তিন চার জনকে ডাকে, দল বেঁধে মাছ ধরতে যায়। এ গ্রাম ও গ্রাম সে গ্রাম—নানা গ্রামে এক এক দিন মাছ ধরার বরাত থাকে, মাছ ধরে আনতে আনতে সকাল।

ভোর বেলা পাখি ডাকা ছাড়াও ভোরের আরেকটা নিশানা হচ্ছে জমিদার বাড়ির মন্দিরে মঙ্গল আরতি। গগনরা যখন বাড়ির পাশ দিয়ে যায় তখন মন্দিরে আরতি করেন পুরোহিত নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য মশায়, আর ঘণ্টা বাজায় বিশু। সে ঘণ্টার শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যায়।

ভট্টাচার্য মশায় জমিদার বাড়ির কাছাকাছিই থাকেন। ভোরবেলা তিনি এসে বিশুকে ডাকেন। বিশুর ঘরের এককোণে একটা গরদের ধুতি দড়িতে ঝোলে, ঘুম চোখে বিশু ওটা পরে নেয় তারপর মন্দিরে আসে। ঠাকুরমশায় ততক্ষণে মন্দিরের দরজার তালা খুলে আরতির জোগাড় করেন। বিশু এসে চোখ বুজে দাঁড়ায় মন্দির চত্বরে, ঠাকুরমশায় তার গায়ে একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেন ও ঘণ্টার দড়িটা হাতে ধরিয়ে দেন। আরতির সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমশায়ের হাতের ঘণ্টা বেজে উঠলে বিশুও দড়ি টেনে টেনে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করে। আরতি শেষ হলে ঠাকুরমশায় বাড়ি চলে যান, আর বিশুও ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ঠাকুরমশায় আবার আসেন, বাল্যভোগ দেন, পূজার্চনা করেন। মন্দির খোলাই থাকে।

সারা পঞ্চসায়র গ্রামে ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম ভেঙে ওঠার লোক এই ছয়জন। ছয়জন

না বলে সাড়ে পাঁচজন বলা যায়। কারণ, বিশু কিছুক্ষণের জন্য অর্ধ জাগরিত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

মাছ ধরে বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে প্রথমেই গগন জমিদার বাড়িতে বিক্রি করে যায়। গতকাল কর্তামা বলেছিলেন—গগন, কাল একটু তাড়াতাড়ি মাছটা দিও, রাজু আমার সকাল সকাল খেয়ে স্কুলে যাবে।

—কত সকালে কত্তামা?—গগন জানতে চেয়েছিল।

—সকাল মানে ওই দশটার সময় যাবে আরকি, তা পুঁটির মা রান্না করবে তো! —কর্তমা বলেছিলেন।

তা গগন তাড়াতাড়িই মাছ দিয়ে গিয়েছিল। নায়েব মশাই রোজ দাম দেন, তখনও নায়েবমশাই আসেননি, তাই বাজারে বিক্রি শেষে ফেরার সময় গগন পয়সা নিতে এল, এসে দেখল নায়েবমশাই, পুরুতমশাই আর বিশু কিছু বলাবলি করছে। গগন এসে দাঁড়িয়ে গেল। ওরা উত্তেজিতভাবে কথা বলছিল।

—তুমি যখন আরতি করছিলে ঠাকুরমশাই তখন কিন্তু আমি দেখেছি ওটা ওখানে ছিল—বিশু বলল।

—তুই তো ব্যাটা রোজ চোখ বুজে ঘণ্টা বাজাস, আর ওই ছোটখাট জিনিসটা তুই দেখেছিস? —ঠাকুরমশাই প্রতিবাদ করলেন।

—তুমি তো খালি আমাকে ঘুমোতেই দেখ! আমি রোজ মায়ের চরণের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে তবে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করি, আমি তো তোমার পিছনে থাকি, তুমি কি করে দেখবে আমার ভক্তি! আজও নমস্কার করার সময় আমি ওটা দেখেছি।

অকাট্য প্রমাণ, এরপর কোনো কথা চলে না।

—কি হয়েছে কি? —গগন জিজ্ঞাসা করল।

—ওই যে ঠাকুরের বেদীতে যে মঙ্গলপত্রটা থাকে, ওটা নেই, —বিশু বলল— কিন্তু ভোরবেলা আরতি করার সময় ওটা ছিল।

গ্রামের সবাই ওই মঙ্গলপত্রটার কথা জানে বা দেখেছে। ওটা যেন ঠাকুরেরই একটা অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। ঠাকুর প্রণাম করার সময় ওটির দিকে তাকিয়েও সকলে প্রণাম করে আর মঙ্গল কামনা করে।

—তাই তো, খুবই অমঙ্গলের কথা—গগন বলল।

—কিন্তু আমি যা বলতে চাইছি, তা হলো গিয়ে ওটা তাহলে ভোরবেলা আমরা চলে যাওয়ার পরই কেউ সরিয়েছে—বিশু বলল।

—আগেই সরাক আর পরেই সরাক তা জেনে আমাদের লাভটা কি? বললেন নায়েবমশাই—যাও যে যার কাজে যাও, কি আর হবে! এসো গগন, পয়সা নিয়ে যাও।

—কিন্তু নায়েবমশাই আমরা যখন ভোরের বেলা মাছ ধরতে যাচ্ছিলুম তখন একজন কেউ যেন পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল মনে হচ্ছে, তখন যাওয়ার তাড়া, তাছাড়া মনেও হয়নি চোরটোর, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নিশ্চয় ওই লোকটাই চোর। ঠাকুরমশায় চলে যাওয়ার পরই ওটা নিয়ে সটকেছে, ঠাকুরের গয়নাগাটিও নিয়েছে বোধহয়?

—না না, সেসব ঠিক আছে—বললেন নায়েবমশাই।

—ইস্, তখন যদি বুঝতে পারতুম ঠিক ব্যাটাকে জাপটে ধরতুম গো—আফশোস করতে লাগল গগন।

গগন চলে যাচ্ছিল, নায়েবমশাই ডাকলেন—ও গগন, শোনো শোনো, বলি ছেলেটা যে হনুমানের মতো এর গাছ ওর গাছ ঠেঙিয়ে বেড়াচ্ছে, তা ওকে ঘরে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করো। কালকে তো আশু বুড়ির আমগাছের মগডালে দেখি বসে আছে আর আশু বুড়ি তোমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছে।

—কি করব বলুন, যাহোক তবু এতদিন সতু মাস্টারের ইস্কুলে পড়ছিল, তা সেখানে তো পাঁচ কেলাস পাশ হয়ে গেল।—গগন বলল।

—পাশ হয়ে গেল! একেবারে এম. এ. পাশ হয়ে গেল, আর পড়বার কিছু নেই! তাইতো বলছি, তাহলে ঘরে বেঁধে রাখো।

—আজ্ঞে ইচ্ছে তো যায় ছেলেটা একটু লেখাপড়া শিখুক, কিন্তু কি যে করি কাকে ধরি কিছুই বুঝতে পারি না।

—শোনো, শোনো গগন, দিনকাল যা আসছে তাতে তোমার ওই মাছচাষ করতে গেলেও লেখাপড়া জানতে হবে, বুঝেছ! কাকে বোঝাচ্ছি! নায়েবমশাই নিজেই

নিজেকে ধিক্কার দেন—একদিন নাহয় মাছ বিক্রিটা একটু কম করে ছেলেটাকে নিয়ে কুসুমপুরের হাইস্কুলে যাও না, রেজাল্টটা নিয়ে গিয়ে হেড মাস্টারমশাইকে ধরো না।

—দেখি কালকে নয় যাবোখন, আসলে কি জানেন আমরা সব মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, একটু পরামর্শ দেবারও কেউ নেই, তবু আপনি যাহোক বললেন।

বাড়ি এসে গগন চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করল—নারাণের মা, কোথায় নারাণ, তাকে দেখি একবার পিঠের ছাল তুলি, লোকের গাছ ঝুমড়ে অত্যাচার করে বেড়াবে, লোকে চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে গালাগালি দেবে, আমাকে ডেকে ডেকে কথা শোনাবে—

—কি হয়েছে কি? বলতে বলতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো নারাণের মা—অত চেঁচাচ্ছ কেন?

—ছেলেটাকে একটু শাসন করে ঘরেও রাখতে পার না? সেই রাত থাকতে উঠে রোজগারে বেরোব না ছেলে আটকাব?

—হ্যাঁ, কচি ছেলে তোমার, কোমরে দড়ি বেঁধে দুয়ারে বসিয়ে রাখব। ওর চেয়ে আমার মেয়ে ভালো, তবু একটু আনাজ কুটে একটু বাটনা বেটে আমার সুসার করে।

এমন সময় নারাণ—ও মা, খিদে পেয়েছে, ভাত দাও—বলতে বলতে বাড়ি ঢুকল, ঢুকে আবহাওয়াটা কেমন যেন গরম মনে করে একবার বাপের আর একবার মায়ের মুখের দিকে চাইল। তার আদুল গা, প্যান্টের পকেটের কাছটা ছেঁড়া, একমাথা চুল যেন জটা।

—কেন, লোকের গাছের আম খেয়ে পেট ভরেনি? তাহলে বরং চাড্ডি আমপাতাই নাহয় চিবিয়ে আয় না! কেমন হনুমানের মতো চেহারা দেখো না! চানটান করা নেই কিচ্ছু না, ভাত দাও! এটা কি মানুষ! শোন্, কালকে বেলা দশটার সময় তোকে নিয়ে কুসুমপুর স্কুলে যাব, সকাল থেকে কোথাও বেরোবি না। স্ত্রীর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল—কালকে সকাল সকাল ফ্যানভাত আর আলুভাতে করে দিও।

৪

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তিনটে সেকশন—ক, খ, গ। 'ক' সেকশনে কুসুমপুর বিদ্যালয়েরই ছেলেরা যারা ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা আছে, 'খ' সেকশনে আছে যারা মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা, আর 'গ' সেকশনে আছে কোনোরকমে পাশ করা কিংবা ঠেলেঠুলে তুলে দেওয়া দুচারজন, আর আছে বহিরাগত। আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম থেকে ছেলেরা এসে এখানে ভর্তি হয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে।

এই সেকশনে পঁয়তাল্লিশ জন ছেলের মধ্যে কুসুমপুর বিদ্যালয়ের অগাবগা ছাত্র আছে জনা আষ্টেক, বাকি সবাই বহিরাগত। এই আটজনের মধ্যে চারজন আবার মহা বিচ্ছু। বাকি চারজন নিরীহ হলেও ওদের তালেই তাল দিয়ে চলে। ক্লাশ শুরুর প্রথম দিন থেকেই ওরা হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে ওরা কুসুমপুর গ্রামের ছেলে, আর বাকিরা এসেছে অন্য গ্রাম থেকে, তাই যেন সমঝে চলে। প্রথম দিনই ওদের দলপতি নীহার ক্লাশের সবচেয়ে নিরীহ এবং সঙ্কুচিত ছেলে রাজুকে পাকড়াও করল—এ্যাই, তোর নাম কি?

বিদ্যালয় সম্পর্কে রাজুর কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, তাই এই নতুন পরিবেশে স্বভাবতই সে সঙ্কুচিত, কোনোক্রমে জড়িত কণ্ঠে সে উত্তর দিল—রাজু।

—ভালো নাম কি?

—রাজেন্দ্রনাথ রায়।

—রাজাবাবু!—ব্যাঙ্গের স্বরে বলল নীহার, সঙ্গীরা হো হো করে হেসে উঠল। আরও গুটিয়ে গেল রাজু।

—কোথা থেকে আসা হয়েছে?

—পঞ্চসায়রের জমিদারবাড়ি।

—ওরে বাব্বা! একেবারে রাজকুমার!—আবার সকলের হাসি। এভাবেই শুরু।

পঠনপাঠনের সময় রাজু কিন্তু খুবই সপ্রতিভ। চক্ হাতে নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে অনায়াসে অঙ্ক কষে দিয়ে কিংবা শক্ত বানান ও অর্থ বলে দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই সে ক্লাসের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। কিন্তু চক্ষুশূল হয়ে উঠল নীহারদের।

ইতিমধ্যে সবাই দেখেছে রাজুকে সাইকেলে স্কুলে দিয়ে যাওয়া নিয়ে যাওয়া। সেদিন ক্লাশ শুরুর আগে নীহার হঠাৎ বলল—এ্যাই, এ্যাই সব চুপ চুপ।—সবাই চুপ করে গেল।

—এই, তোমরা সবাই রথ দেখেছ?—নীহার বলল।

—হ্যাঁ, —অনেকেই চেঁচিয়ে উঠল।

—কিসের রথ?

—জগন্নাথের রথ—অনেকে বলল।

—আরে না না, সে রথ নয়, রাজার রথ।

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

—আমাদের রাজকুমার যে রথে চেপে স্কুলে আসে!

নীহারের দলবল জোরে জোরে হেসে উঠল।

—তবে কিনা এ রথের দুটো চাকা, আর সারথির গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি।

আবার একচোট হাসির হল্লা। রাজু লজ্জায় অপমানে সঙ্কুচিত হয়ে বুঝি মাটিতে মিশে যাবে। এ সময় অঙ্কের স্যার ক্লাসে প্রবেশ করায় সবাই চুপ করে যে যার জায়গায় বসে পড়ল।

—একটি সুপারি বাগানে যত সারি সুপারি গাছ আছে প্রত্যেক সারিতে ততগুলিই গাছ আছে, যদি বাগানে মোট চৌষট্টিটি সুপারি গাছ থাকে তবে কয় সারি গাছ আছে এবং প্রত্যেক সারিতে কয়টি করে গাছ আছে? —দুবার ধীরে ধীরে অঙ্কটি বলে গৌতম স্যার বললেন—এটা কিন্তু মৌখিক অঙ্ক, বলো, নীহার বলো।

নীহার উঠে দাঁড়াল, বলল—চৌষট্টিটি সুপারি গাছ স্যার?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—দশ সারি গাছ স্যার—একটুও সময় না নিয়ে বলে দিল নীহার।

—বাঃ! —স্যার বললেন, একেবারে ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছ।

নীহার বিজ্ঞের মতো মুখভাব করে হাসল।

—এবার বেঞ্চের ওপর দাঁড়াও তারপর বল কিভাবে অঙ্কটা করলে।

—এ্যাঁ।

—শুনতে পাওনি? তাহলে কি কান ধরে তুলে দেবো?

কুণ্ঠিত নীহার বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল।

—এবার বল সকলে শিখুক কিভাবে অঙ্কটা করলে।

নীহার চুপ।

—বল, বল—স্যার চেঁচিয়ে বললেন।

নীহার চুপ।

—বল, রাজু বল।

—আট স্যার—রাজু উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

—কিভাবে হল? জোরে জোরে বল, সকলে যাতে শুনতে পায়।

—সমান সমান সংখ্যার গুণফল চৌষট্টি করতে হবে। আট গুণিতক আট সমান চৌষট্টি। আট সারি সুপারি গাছ, প্রত্যেক সারিতে আটটি করে সুপারি গাছ আছে।

পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে উজ্জ্বল মুখে রাজু কথা বলছিল। এখন আর তার মধ্যে কোনো লজ্জা সঙ্কোচ বা অপমানিত হওয়ার আক্ষেপ নেই।

—ভেরী গুড! বোসো। লেখাপড়ায় একটু মন দাও নীহার—বললেন স্যার—আচ্ছা দশ যদি উত্তর হয় তাহলে সুপারি গাছের সংখ্যা কত হবে? —এটা কি এবার বলতে পারবে? নীহারকেই বললেন স্যার।

নীহার শুকনো মুখে চুপ।

—তার মানে তুমি কিছুই বোঝনি, বা বুঝতে চেষ্টা করনি। আচ্ছা, উত্তরটা প্রত্যেকে খাতায় লেখ। কেউ কাউকে দেখাবে না। একে একে এসে আমাকে দেখিয়ে যাবে। যার যার উত্তর ভুল হবে আমি তাকে আবার বুঝিয়ে দেব, কেমন? এখন রোল কল করা যাক।

ক্লাসে অনেকেই টিফিন আনে না, কেউ কেউ মুড়িটুড়ি নিয়ে আসে, আবার অনেকে স্কুলের পাশের গলির দোকান থেকে কিনে খায়। স্কুলের কাছাকাছি যারা থাকে তারা বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসে। রাজুকে কিন্তু ঠাকুমা রোজ টিফিন বাক্সে ভালো করে টিফিন গুছিয়ে দেন। ছানা কলা কিংবা লুচি আলুভাজা—এসব সকলের সামনে খেতে রাজুর লজ্জা করে। ক্লাসের ছেলেরা যখন স্কুল কম্পাউন্ডে ছুটোছুটি খেলাধুলো করে তখন রাজু ক্লাসের একধারে পিছন ফিরে বসে টিফিন খেয়ে নেয়।

অপমানে সেদিন ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল নীহার, রাজুর খাওয়ার সময় পিছনে এসে দাঁড়াল, বলল—কি খাওয়া হচ্ছে রাজকুমার?

রাজু তখন সবেমাত্র টিফিন বাক্স খুলেছে, নীহার ঝুঁকে পড়ল—বাঃ! এ তো দেখছি ফুলকো লুচি আর আলুভাজা, আবার সন্দেশও আছে দেখছি—বলতে বলতে টপাটপ খেতে লাগল, এবং সবই শেষ করে দিল। ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা হি হি করে হাসছিল। রাজু দুঃখে কষ্টে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, এমন সময় লাফিয়ে নীহারের সামনে এসে দাঁড়াল নারাণ, নীহারের ডান হাতটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে এক পাক দিতেই নীহারকে মোচড়ে ঘুরে যেতে হল, পিঠের ওপর হাতটা ধরে রেখে নারাণ বলল—এটা কি হল?

—ওই একটু চেখে দেখছিলুম। বন্ধু তো!

—বন্ধু! একটু চেখে দেখছিলুম! সবই তো সাবড়ে দিলে। বলে হাতে একটু মোচড় দিল।

—ওরে বাবারে লাগছে লাগছে—নীহার আর্তনাদ করে উঠল, ওর সঙ্গীরা এগিয়ে আসতে গেলে নারাণ ডানহাতে ঘুষি ছুঁড়তে লাগল। সুতরাং আর কেউ এগোতে সাহস করল না।

—ভালো করে কান খুলে শোন, নারাণ বলল—রোজই দেখছি ওর পেছনে লাগা হচ্ছে, আজকে খুবই বাড়াবাড়ি, ও আমার গ্রামের ছেলে, আর কোনোদিনও যদি ওর পেছনে লেগেছিস হাত ভেঙে দেব। আরেকটু মোচড় দিয়ে হাত ছেড়ে দিল নারাণ। নীহার ওরে বাবারে বলে ছাড়া পেয়ে পালাল।

—আজকে তোমার খাওয়া হল না—বলল নারাণ—আমার কাছে মুড়ি আর বাতাসা আছে, খাবে?

—তোমার কম পড়বে।

—তা পড়ুকগে, দুজনে তো খাওয়া হবে! —নারাণ একটুকরো কাপড়ের পুঁটুলি খুলল তার মধ্যে ঠোঙায় মোড়া মুড়ি বাতাসা। দুটো বাতাসা রাজুর হাতে দিল নারাণ, নিজে দুটো নিল, ঠোঙাটা বেঞ্চের ওপর রেখে দুজনে মুঠো করে মুড়ি নিয়ে গালে দিল। দুজনেই হাসল। হয়ে গেল বন্ধুত্ব।

—তুমি আমাদের গ্রামের ছেলে? রাজু জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ।

—কোন পাড়ায় থাক?

—জেলেপাড়ায়, আমার বাবা রোজ তোদের বাড়ি মাছ দিয়ে আসে। এই যাঃ, তুই বলে ফেললুম।

—তুইই ভালো—রাজু বলল—আচ্ছা, ওরা যদি দল বেঁধে তোকে মারে?

—অতই সোজা? আসুক না! কিচ্ছু ভাবিস না, ওরা খুব ভীতু।



৫

—এতদিনকার একটা জিনিস নেই বলতেই নেই, যেন হাওয়ায় মিশে গেল, আর তুমি সেটার খোঁজখবরের কিছু ব্যবস্থা করলে না? বললেন উমারানী।

—কি ব্যবস্থা করব? তুমিই বল! বিরক্তভাবে বললেন ইন্দ্রনাথ।

সকালবেলা নাতিকে পড়াতে বসেছেন ইন্দ্রনাথ, ইতিহাসে আকবরের রাজত্বকাল পড়াচ্ছেন, এমন সময় উমারানী এসে কথাটা পাড়লেন।

—বারে, কোন আদ্যিকাল থেকে সংসারের মঙ্গল করে এলো যে জিনিসটা সেটা হারিয়ে গেল, তা খোঁজ করতে হবে না?

—কেন? এরপর সংসারে সবকিছু অমঙ্গলই হবে? আমরা সব ধ্বংস হয়ে যাবো? তাই যদি হয় তাহলে তোমার ওই মঙ্গলপত্রটা সংসারের কি মঙ্গল করেছে শুনি? ইন্দ্রনাথ যেন তর্কযুদ্ধে আহ্বান করছেন এভাবে গুছিয়ে বসলেন। বললেন—এক এক করে হিসাব করা যাক—শুনেছি মন্দিরের এই বিগ্রহ কোন পুরনো কালে ছিল আগের সেই সিংহগড়ের প্রাসাদে, তখন তোমার মঙ্গলপত্রও ছিল তার সঙ্গে। তা সে প্রাসাদ নদী ভাঙতে ভাঙতে গ্রাস করতে শুরু করলে সব ছেড়ে এ বাড়ি নাকি তৈরি হয়, মন্দির তৈরি করে সেখানে বিগ্রহ তুলে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাহলে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে তোমার ওই মঙ্গলপত্র অমঙ্গলের কিছুই আটকাতে পারেনি, নদীর ভাঙনে তলিয়ে যাওয়ার ভয়ে বরং ওকেই পালিয়ে আসতে হয়েছে। একদমে এত কথা বলে একটু থামলেন ইন্দ্রনাথ, উমারানী উঠে পড়তে চাইলেন।

—না, না, পালালে চলবে না, শুনতে হবে—বললেন ইন্দ্রনাথ—তারপর এই বাড়িতে থেকেও কত উন্নতি সে তো দেখাই যাচ্ছে। জমিদারী গেছে, এতবড় বাড়ির ভগ্নদশা, বাড়ির লক্ষ্মী বউমা অকালে চলে গেছে, আমাদের একমাত্র সন্তান তার স্ত্রীর শোকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে—আর কি কি মঙ্গল করেছে তোমার ওই

মঙ্গলপত্র? বলো, বলো? উত্তেজিতভাবে বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন ইন্দ্রনাথ। দেখলেন উমারানী উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শোকেসের ওপর রাখা ছেলে আর ছেলের স্ত্রীর ছবির দিকে। তাঁর দুগালে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

—না, না, দুঃখ কোরো না—কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল ইন্দ্রনাথের, আসলে সংসারে কিছুই থাকে না, এই দেখ না আকবর বাদশার রাজত্বও থাকেনি, থাকেনি মোগল সাম্রাজ্য, থাকেনি ইংরেজের পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য। সুতরাং, ও নিয়ে শোক করার কিছু নেই, যা গেছে যেতে দাও। তাছাড়া এর আমি কি বিহিত করতে পারি? এ বাড়িতে তুমি আমি রাজু—কেউ ওটা নিইনি। বিশু, সেই ছোটবেলা থেকে এখানে আছে, ওটা নিয়ে সে কি করবে? তার ঘরে রেখে দেবে? আচ্ছা, তার ঘরটা নাহয় খুঁজে দেখা গেল, কিন্তু কিছুই পাওয়া যাবে না জানি। পুরুতমশাইই বা কেন নেবেন? তাহলে? গয়নাগাটি চুরি হলেও নয় থানায় গিয়ে বলা যেত। এটার জন্য বলতে গেলে ভাববে পাগল।

উমারানী ধীরে ধীরে উঠে পড়লেন নিঃশব্দে, তা দেখে ইন্দ্রনাথ বললেন—তবে তুমি যদি চাও তাহলে না হয় আমি জগা স্যাকরাকে ডেকে আরেকটা মঙ্গলপত্র তৈরি করে দিই। ওই তো ঘরকাটা কাটা আর এক একটা ঘরে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মঙ্গলঘট, বেলপাতা—এইসব কি কি যেন খোদাই করা ছিল।

উমারানী ততক্ষণে বারান্দা দিয়ে চলে যাচ্ছেন, অসহায় দৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, বুঝতে পারলেন এখন উমা মন্দিরে যাবে, চোখের জলে ভেসে প্রার্থনা করবে ছেলে যেখানেই থাকুক যেন ভালো থাকে।

—হ্যাঁ, আকবরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্য—ইন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তকে চোখ দিলেন।

—আচ্ছা দাদু, আমাদের আগের বাড়ি কোথায় ছিল? —রাজু জিজ্ঞাসা করল।

—সেসব বহুকাল আগের কথা, সে আমিও দেখিনি, আমার বাবা হয়তো ছোটবেলায় দেখেছিলেন—আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে গেছে একটি ছোট নদী, এককালে ওই নদী ছিল অনেক বড়, ওই নদীর একটু দূরে ছিল সেই বাড়ি। তারপর নদী হঠাৎ পাড় ভাঙতে শুরু করে, ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসে বাড়ির

কাছে, বাগান পুকুর সব গ্রাস করে নদী এগিয়ে আসে, ভেঙে পড়ে প্রাসাদ—এখন এই নদী দেখে বোঝাও যায় না এককালে ওটা অমন ভয়ঙ্কর ছিল, এখন হেজেমজে যেতে যেতে সামান্য খালের মতো। ওখানে নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে সামান্য কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। সেটা দেখেছি।

—আমাকে একদিন নদী দেখাতে নিয়ে যাবে দাদু?

—এ আর বেশি কথা কি, পশ্চিমপাড়ার ওধারে গেলেই তো দেখা যায়। তবে দেখে হতাশ হতে হবে।

—তা হোক, তবু আমি দেখতে যাব, আমি কখনও নদী দেখিনি।

—দেখবে দেখবে, কত নদী, সমুদ্র, পাহাড় পর্বত— বিশাল এ পৃথিবী, কত বড় বড় শহর গড়ছে মানুষ, সব দেখবে বইকি। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু সেসব জানার জন্য, দেখার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে, আর নিজেকে তৈরি করার একমাত্র পথ হচ্ছে শিক্ষা। লেখাপড়ার মাধ্যমেই মানুষ এগিয়ে যেতে পারে, সেইসব আবিষ্কারে তুমিও সামিল হবে এই আমার আশা।

—আচ্ছা দাদু, ওটা মন্দির থেকে কে নিয়েছে? —রাজু জিজ্ঞাসা করল।

—এটাই তো অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু এটা আমাদের সাবধান হওয়ার সঙ্কেত। এত সহজে আমাদের বাড়ি থেকে জিনিস চুরি হতে পারে দেখা গেল। আমাদের অনেক সাবধান হতে হবে। ঠাকুরমশাইকে আমি বলেছি ভোরবেলা মঙ্গল আরতির পর মন্দিরে আবার তালা দিতে। সকালে বাল্যভোগের সময় আবার খুলবেন। তুমিও সাবধান হতে চেষ্টা করবে, চারিদিকে নজর রাখবে সাধ্যমতো।

৬

শিবু পালের আড়তে কাজটা হয়ে গেল সনাতনের। সবই ভগবানের কৃপা। মনে মনে বলেছিল সনাতন। বেরিয়ে পর্যন্ত সব কাজই উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে। এভাবে শেষ কাজটি উদ্ধার হলে ব্যস্! জীবনের সব সাধ পূরণ হয়ে তো যাবেই আরও কত কি যে হবে।

যেদিন পঞ্চসায়র গ্রামের কাজটি উদ্ধার করে ফিরল সনাতন সেদিনের ঘটনা। শিবু পালের আড়তের সামনে দিয়ে যেন আনমনে যাচ্ছে—আসল উদ্দেশ্য সুযোগ খুঁজে নেওয়া—তা সুযোগ হয়ে গেল। সাইকেল ভ্যানে বস্তা তুলছিল ভ্যানওলা, দুটো বস্তা তুলেছে, তার ওপর আরেকটা তুলতে গিয়ে বস্তাটা ভালো করে তুলতে পারেনি, ফস্কে পড়ে যায় আর কি! সনাতন আহাহা করে ছুটে গিয়ে বস্তাটা ধরে অনায়াসে তুলে দিল। শিবু পাল দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, সনাতনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বললেন—গায়ে তাকত আছে দেখছি, কিন্তু অচেনা মনে হচ্ছে, মাল গস্ত করতে নাকি?

—আজ্ঞে না কত্তা, গরীব মানুষ মাল গস্ত করব কি, এই কাজকম্মের ধান্দায় ঘুরছি।

—তা কি কাজ করতে পারবে?

—আজ্ঞে যা বলবেন, মাল তোলা থেকে ঘর ঝাঁট দেওয়া, ওদিকে রান্না করা থেকে বাসন মাজা পর্যন্ত।

—রান্নাও করতে পারো?

—ওই আর কি, আমাদের গরীব মানুষের রান্না—ডাল-ভাত-তরকারি, তবে কি না মাছটাছ এখন আর রাঁধতে পারি না, বেশ ক বছর ধরে নিরামিষ খাচ্ছি তো, মাছ মাংসের গন্ধে গা গুলোয়।

—তাই নাকি? বোষ্টম হয়েছ নাকি? নাম কি তোমার?

—সনাতন দাস।

—বোষ্টম বোষ্টমই তো শুনতে লাগছে। তা আমার কাছে যারা কাজ করে এক তরকারি ডালভাত পায়, আর সকালের জলখাবার এক ডিবে মুড়ি।

—খুব ভালো কত্তা, পেট ভরে ভাত পেলে মাছের কি দরকার বলুন, ওতে আর পেটের কতটুকু ভরে!

—বেশ বেশ ওই কথাটা বোঝে কজন। মাইনে ওই পঁচিশ টাকা রোজ। আজ থেকেই লেগে পড়। তবে একটা কথা বলে দিই, হাতটানের দোষ নেই তো? চারিদিকে অঢেল মাল, দু এক কিলো চাল সরিয়ে ফেললুম—কিছু মনে কোরো না তোমাকে বলছি না, বলছি এসব স্বভাব যাদের থাকে তাদের জায়গা কিন্তু থানায়, তার আগে পাহারাদার ডেকে বেশ দলাইমলাই করে দেওয়া হবে। বাজারের পাহারাদারদের ভালো করে দেখে নিও।

সনাতনের বুকটা ধুকধুক করে উঠল, কিন্তু এখানে এসব ছুটকো ধান্দাবাজি সে করতে যাবে কেন? তাই জোর গলায় বলল—ওসব করে জীবনে কিছু উন্নতি হয় কত্তা? জাতও যায় পেটও ভরে না, মাঝখান থেকে কাজ তো যাবেই, কেউ আর কাজে নেবে না।

—তুমি খুব বুঝদার লোক হে, এসব কথা তো সবাই বোঝে না, বুঝলে না।

কাজটা হয়ে গেল। সবই ভগবানের ইচ্ছা —মনে মনে ভাবল সনাতন।

এসব কথা সনাতন দাসও আগে বুঝত না। বাপ নেই মা নেই, জ্যাঠার সংসারে ফেলনা সনাতন, ছুটকো কাজ যত তার ঘাড়ে। খাওয়া পরার অভাব না থাকলেও নগদ পয়সা হাতে একদম নয়, সেই ছোটবেলা থেকে এক হাল। স্কুলেও পাঠায়নি জ্যাঠা, ওই ফালতু খরচটা সনাতনের পেছনে করে কি লাভ হবে?

সেই ছোটবেলা থেকেই তার হাতটান। প্রথম প্রথম নিজেদের বাড়িতে, তারপর নিজেদের পাড়ায়, তারপর এ পাড়া ও পাড়া, তারপর এ গ্রাম ও গ্রাম—বয়সও বাড়ছে কাজের পরিধিও বাড়ছে! জিনিস শুধু সরালেই চলবে না, বিক্রি করতে হবে, চোরাই মাল কিনবার সেরকম পার্টির সঙ্গেও ভালো যোগাযোগ হয়েছিল।

কিন্তু জ্যাঠা একেবারে মূলোচ্ছেদ করে দিল, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। খুবই বিপদে পড়ে গেল সনাতন, খাওয়াটা তার একটু বেশিই, সেই টানে সদরে গিয়ে একটা হোটেলে চাকরি হয়ে গেল। কয়লা ভাঙা থেকে শুরু করে ছাই ফেলা পর্যন্ত। আর তখনই সনাতন বুঝল হাতসাফাই ছাড়তে হবে, না হলে পেটের ভাত জোগানোর নিশ্চিন্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব সনাতন একেবারে সাধুপুরুষ হয়ে গেল। তারপর থেকে সে আর চুরচামারি করেনি।

হোটেলে কাজ করতে করতে অনেক কাজই শিখে ফেলল সনাতন, তারপর জুটে গেল একটি ট্যুরিস্ট পার্টির সঙ্গে। খুব মজা! কত জায়গায় ঘোরা, খাওয়াদাওয়া ফ্রি, মাইনে অবশ্য খুবই কম, তাও আবার বাকি থাকে। যাইহোক ঘুরে বেড়িয়ে কাটছিল ভালোই। মাঝে মাঝে ফিরে এসে কয়েকদিনের ছুটি, তখন এটা ওটা কিনে নিয়ে চাঁপাডাঙায় জ্যাঠা জ্যেঠিমার কাছে। জ্যাঠাইমার তখন কত আদর! এটা ওটা রান্না করে—খা বাবা, খা বাবা করে একেবারে আদিখ্যেতার চূড়ান্ত।

কিন্তু গণ্ডগোলটা বাধল সেবার হরিদ্বার গিয়ে। চল্লিশ জন যাত্রী নিয়ে সেবার ঘুরতে যাওয়া হয়েছে, ঘুরে বেড়িয়ে ফেরার দুদিন আগে সনাতনের ধুম জ্বর। সে একেবারে অজ্ঞান অবস্থা। এটা ওটা ওষুধ খাইয়ে মালিক যখন দেখলে কিছুই সুবিধা হচ্ছে না তখন ধর্মশালার কেয়ারটেকারের হাতে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে আর ওই সংলগ্ন আশ্রমের সাধুবাবাকে হাতেপায়ে ধরে সনাতনকে দেখতে বলে ফেলে রেখে চলে গেল।

সনাতন এসবের কিছুই জানতে পারেনি, পরে সাধুবাবার মুখে শুনেছে। যাইহোক সেরে যখন উঠল, দেখল তার পাওনা মাইনেপত্তর কিছুই দেয়নি এবং শ্রীগুরু ট্রাভেলার্স, আর পানুদা নামটা ছাড়া তার আর কিছুই জানা নেই। তখন দুর্বল শরীরে তার ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

অবশ্য ভিক্ষা তাকে করতে হয়নি, সাধুবাবার দয়ায় আশ্রমেই থেকে গেছে। নানান কাজকর্ম, ধর্মশালার দেখাশোনা করা, খাওয়াদাওয়ার অভাব নেই। কিছু কিছু হাতখরচও পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় যাত্রীদের থেকে কিছু উপরি, তা বকশিস বললেও বলতে পার, আবার সভ্য করে ইংরাজিতে সার্ভিস ট্যাক্সও বলতে পার।

কিন্তু এভাবে দিনযাপন সনাতনের আর ভালো লাগে না। তার মনে পড়ে চাঁপাডাঙায় তাদের ভাঙা ভিটেটার কথা। আবছা মনে পড়ে খুব ছোটবেলার কথা—মা তুলসিতলায় পিদিম দিত।

ব্যস্, আর কিছু মনে পড়ে না, শুধু ঐটুকু ছবি কেন যে মনের মধ্যে রয়ে গেছে! ছবিটা সনাতনকে আনমনা করে দেয়। কোনো কোনো দিন অবসর সময়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় মূল গঙ্গার ধারে, সেখানে কোনো ঘাটে বসে দূর বালির চরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা হুহু করে ওঠে, তার মনে হয় নিয়মিত রোজগারের একটা সামান্য কাজ যদি থাকত তার!

বিয়ে করে সংসার পাততো, ঘরটা সারিয়ে ঝকঝকে উঠোনের মাঝে মাটি দিয়ে নিজ হাতে তৈরি করত তুলসি মঞ্চ। উঠোনের ধারে ধারে গাছ লাগাত, পিছনের জমিটুকুতে লাউ, কুমড়ো, সিম আর পুঁইগাছ বসাতো, মাচা বেঁধে তুলে দিত লতা।

সন্ধ্যা নামার মুখে বিষণ্ণ মনে মন্থর পায়ে সে ফিরে আসে, তখন বাঁধানো গঙ্গার ধারে আরতি চলছে। কত মানুষ প্রদীপ ভাসাচ্ছে ফুলের ভেলায়। অত মানুষের মধ্যে থেকেও সে একা, ভীষণ একা, তার বুক ফেটে কান্না আসে। এক একদিন কান্না চেপে সেও প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাসায় ফুলের ভেলা, নীরবে নিজের মনোবাসনা জানায় ভগবানকে। এভাবেই কেটে গেছে কয়েকটি বছর...

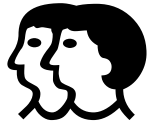
আপাতত গুছিয়ে বসা গেল শিবু পালের আড়তে। আড়তের পিছনে চালাঘর। সেখানে রান্নাখাওয়ার ব্যবস্থা। সনাতন ছাড়াও আছে আরো তিনজন। তবে একটা ভালো হয়েছে ওরা তিনজনই খাওয়াদাওয়া করে চলে যায়। কাছাকাছি কোথাও ঘরভাড়া করে পরিবার নিয়ে থাকে। একটা কাঁঠাল কাঠের আলমারিও আছে ঘরে। একটা ছোট তালাচাবিও পালমশায় দিয়েছেন আলমারিতে লাগানোর জন্য। অত বড় আলমারির একটা কোণে ব্যাগটা রেখে তালা দিয়ে সনাতন নিশ্চিন্ত।

সারাদিন খাটাখাটুনির পর কাঠের জ্বালে রান্নাটা আগে সেরে ফেলে সনাতন। সকলের এই অতিরিক্ত কাজটা তার ঘাড়ে পড়েছে। তাতে অবশ্য একটা সুবিধা—অন্যদের চেয়ে একঘণ্টা আগে ছুটি পায়। তাতে গাধার খাটুনিটা একটু কমে। বসে আনাজ কোটা মশলাবাটা, এসবে আর খাটুনি কি!

রান্না সেরে পুকুরে চান করতে যায় সনাতন। চান করে মেজাজ ফুরফুরে। পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটের বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে। পুকুরঘাটের দুধারে দুটো আমগাছ ঘাটটাকে সারাদিন ছায়ায় ঢেকে রাখে, ভারী ঠাণ্ডা সিমেন্টবাঁধানো রোয়াক। বসে বসে ভাবে এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের জীবন কতরকম ভাবেই না কাটল।

ওরা আগে খেয়ে চলে যায়, সনাতন একটু দেরী করেই খায়। তারপর হাটতলা নিঝুম হয়ে গেলে তাম্রপত্রটি ব্যাগ থেকে বার করে মেঝেতে বসে। কতগুলো ঘর কাটা—এক্কাদোক্কা খেলার ঘরের মতো নাকি শিরম্যান খেলার? এক একটা ঘরে এক একটা চিহ্ন। কোনোটায় শঙ্খ, কোনোটায় চক্র, গদা, পদ্ম, ডমরু, ত্রিশূল, আর আছে কব্জি পর্যন্ত একটা হাতের পাতা। উল্টোদিকটায় আবার কিচ্ছু নেই, শুধু এক কোণে একটা মঙ্গলঘট —অর্থাৎ ঘটের ওপর আমপাতা দিয়ে ডাব বসানো—ওই ছবি। তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ ভারী হয়ে আসে, ঘুমে ঢলে পড়ে, তখন উঠে ওটা সাবধানে ব্যাগের মধ্যে তুলে রাখে, আলমারিতে চাবি দিয়ে দেয়। তারপর ছেঁড়া ফুটোয় গিঁট বাঁধা বাঁধা একটা মশারি টাঙায়। একটা সতরঞ্চি পাতে আর একটা তেলচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে। সনাতন একটু পরিষ্কার থাকতে ভালোবাসে। এটাতে আরো কতজন শুয়েছে কে জানে? সতরঞ্চিটা সে পুকুরে নিয়ে গিয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে কেচেছে, আর বালিশটা রোদে দিয়ে গন্ধ তাড়িয়েছে। সতরঞ্চি দিয়ে বালিশটা চাপা দিয়ে দেয়। ব্যস, একেবারে রাজশয্যা। দিন ফিরলে সে একটা বড় পালঙ্ক কিনবে, গদি, তোষক, ফুল আঁকা চাদর বালিশ, একটা পাশবালিশ—ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে সনাতন, তার মুখে লেগে থাকে এক টুকরো তৃপ্তির হাসি।

৭



—ও ঠাকুমা, একটু বেশি করে টিফিন দিও তো রোজ।

—সে কি রে? এই বলতিস এত দিও না, খেতে পারি না, হঠাৎ কি হলো? খিদে বেড়ে গেল?

—দিও না তুমি, সে দরকার আছে।

—দরকারটা কি বলবি তো?

—অত বলতে পারি না, যাও।

—বুঝতে পেরেছি, স্কুলে বন্ধু হয়েছে তো?

—তাই তো।

—তা সেটা বললেই হয়! কতজন বন্ধু হলো?

—আমার একটাই বন্ধু, নারাণ। ও টিফিন আনে মুড়ি আর বাতাসা। এক একদিন ছোলাভাজাও আনে। জানো ঠাকুমা, ও বলে মুড়ি, ছোলা, এসব ওর মা ভাজে। আচ্ছা, মুড়ি কি করে ভাজে ঠাকুমা?

ঠাকুমা হেসে অস্থির। নাও, ছেলেকে এখন মুড়ি ভাজা শেখাতে বসি, পুঁটির মাকে বলবখন যেদিন মুড়ি ভাজবে তোকে দেখাতে। কিন্তু আজেবাজে বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না যেন।

রাজু আর নারাণের খুব বন্ধুত্ব। এ গ্রামের আরো কয়েকটি ছেলে কুসুমপুর বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তাদের সঙ্গে রাজুর ভাব হয়নি তা নয়, কিন্তু নারাণের সঙ্গে বন্ধুত্ব একটা অন্য মাত্রা পেয়ে গেছে। দুজনে একসঙ্গে বসে ভাগাভাগি করে টিফিন খায়। আর টিফিন খাওয়ার সময় নারাণ রাজুকে শোনায় নানান গল্প।

রাজু এতদিন কাটিয়েছে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে, এখন নারাণ রাজুকে শোনায় মুক্ত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা আর আনন্দের কথা। নিজস্ব চিন্তাভাবনা দিয়ে রাজু বোঝে নারাণের কার্যকলাপ সবগুলি ভালো ছেলের কাজ নয়। তবু তার

অনেকগুলিই রাজুর ভালো লাগে। সে বুঝতে পারে এ বন্ধুর বন্ধুত্ব দাদু ঠাকুমা মোটেই পছন্দ করবে না। তাই এখন সে অনেক কথা গোপন করতে শিখেছে।

নারাণ তাকে শোনায় পাখিরা বাসায় ডিমগুলি কেমন সাজিয়ে রাখে, গাছে উঠে দেখেছে নারাণ। পাখিরা কেমন করে ডিমে তা দেয়, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোলে সেগুলি কেমন দেখতে হয় আর তারা কেমন হাঁ করে খাবার চায়। আর এসব দেখতে পাখির বাসার কাছে গেলে পাখিরা কেমন মাথার উপর উড়ে উড়ে চিৎকার করে আর ঠোকর মারে মাথায়।

নারাণদের বাড়ি ছোট নদীটির ধারে। সেখানে তাদের একটা ডিঙি নৌকো বাঁধা থাকে। নারাণ শোনায় সে কেমন নৌকা বাইতে পারে একাই। কেমন মাথা ঘুরিয়ে জাল ফেলে মাছ ধরতে পারে। ডুব সাঁতারে এক ডুবে কতদূর চলে যেতে পারে নারাণ—যেমন পানকৌড়িরা যায়।

এসব কত গল্প শুনতে শুনতে রাজু শিহরিত হয়, তারও ইচ্ছা করে অমন করে ছোটাছুটি করতে প্রকৃতির আঙিনায়।

রাজুর খুব ইচ্ছা নদীর ধারে অন্তত বেড়াতে যায়।

—এ আর এমন কি ব্যাপার—নারাণ বলে—তোদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা পশ্চিমপাড়া পেরিয়ে চলে যাবি, তারপর আরেকটু গেলেই তো নদী।

—বা রে, আমি একলা ওরকম যাই নাকি?

—ঠিক আছে, তাহলে এক কাজ কর, —একটু ভেবে নারাণ বলে—রবিবার দুপুরবেলা আমি তোদের পিছনের বাগানে পাখি ডাকব—বলে সুন্দর পাখির ডাক শোনায় নারাণ। এই ডাক শুনে তুই চুপি চুপি বেরিয়ে আসবি। বাগানের পাঁচিল তো ভাঙা। ওখান দিয়ে কতবার আমি তোদের বাগানে পেয়ারা, আম, জামরুল পাড়তে গেছি। ওঃ! তোদের ওই গোলাপজাম—আঃ! যা সুন্দর গন্ধ!

—আঃ, গোলাপজামের কথা কে জিজ্ঞাসা করছে, তারপর কি করব তাই বল।

—ওই তো, ভাঙা পাঁচিল দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবো, সে আমি তোকে নিয়ে যাবো।

—তারপর?

—অবশ্য তাড়াতাড়ি চলে আসতে হবে। আবার ওইদিক দিয়েই বাগানে ঢুকবি। জিজ্ঞাসা করলে বলবি বাগানে ঘুরছিলি।

অতঃপর নদীর ধারে। রাজুর বুকের মধ্যে সে কি উত্তেজনা! একটি গেঞ্জি গায়ে বেরিয়েছে রাজু। নারাণ তাকে জামাটামা পরে আসতে বারণ করেছে। সোজা রাস্তা দিয়েও আসেনি ওরা, নারাণ তাকে নিয়ে এসেছে আঁকাবাঁকা অলিগলি বনবাদাড় দিয়ে। বলা যায় না কার চোখে পড়ে যাবে, খবর চলে যাবে দাদুর কাছে।

—আমাদের বাড়িতেও তোকে নিয়ে যাব না। মা হয়তো পাড়া মাথায় করবে। ও মা, আমাদের বাড়ি কে এসেছে গো! আর সবাই এসে জুটবে, ব্যস, কারো আর জানতে বাকি থাকবে না।

এখন নদীর ধারে একটা অশথ গাছের তলায় বসেছে দুজন। গাছে কি যেন পাখিরা ডাকাডাকি করছে। একটু নিচে জল মৃদু স্রোতে বহে চলেছে। একটা ছোট নৌকা বাঁধা, কেমন ছোট ছই দেওয়া। রাজু এক রূপকথার রাজ্যে যেন।

—এই নৌকোটা আমাদের, একদিন তোকে নৌকো করে নিয়ে যাবো। এই নদী দিয়ে গেলে একটা বিল পড়ে, সেই বিলের নাম পদ্ম বিল। সে একটা বিরাট পদ্মবন, কত ফুল ফুটে আছে, কত কুঁড়ি মাথা তুলে আছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রাজু। তার চোখ স্বপ্নময় হয়ে যায়। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে উঠতেই হয়। নারাণ তাগাদা দিয়ে ওঠায়। রাজু বাস্তব জগতে ফেরে। সত্যিই তো দাদু কি ঠাকুমা যদি খোঁজে? সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে বাড়ি ফেরার জন্য।

ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে ঢোকে রাজু, পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে। একটা মাছরাঙা পাখি একটু দূরে গাছের ডালে বসে আছে। পাখিদের কি মজা—ভাবে রাজু, উড়ে উড়ে কতদূর চলে যেতে পারে যেখানে খুশি, যখন খুশি।

এই বাগান, পুকুর, এই ছিল তার জগত। এই পুকুরে তাকে সাঁতার শিখিয়েছে বিশু। সে জলে নামলে পুকুর তাকে আপন করে নেয়। এই গাছেরা তার বন্ধু। এই গণ্ডি ছাড়িয়ে আজ রাজু আরও কত অজানা জনের জগতে চলে গিয়েছিল। নদীর ধারের সেই অশথ গাছ, সেই ডিঙি নৌকো, তার চোখে যেন ভাসে। সে আনমনা হয়ে যায়।

৮

কুসুমপুরে হাট বসে শুক্রবার। আড়ত বাজার সেদিন বন্ধ থাকে। হাট বসে বাজারের পেছনের মাঠে। চারপাশের গ্রাম থেকে সব লোকজন আসে। যতসব খুচরো খদ্দের, সেজন্যই বোধহয় পাইকারী আড়তের সেদিন বন্ধের দিন।

শুক্রবার সনাতন হাটে ঘুরে বেড়িয়ে কাটায়। আগের দিন রাত্রে বেশি করে ভাত রাঁধে, ওই ভাতের খানিকটা জল দিয়ে রাখে, মঙ্গলবার সকালে আর মুড়িটুড়ি খায় না, রান্নার ঝামেলাও করে না। বেগুনি আর আলুর চপ দিয়ে পান্তাভাত একটু তাড়াতাড়িই খেয়ে নেয়। এই গরমে তেলেভাজা দিয়ে ঠাণ্ডা পান্তাভাত! আহা! অমৃত কেমন খেতে কে জানে? কিন্তু এর চেয়ে কি অমৃত সুস্বাদু? হতেই পারে না।

তৃপ্তি করে পান্তা খেয়ে সনাতন হাট ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। কত রকমের জিনিষ আর কত রকমের মজা যে হাট জুড়ে! এমনকি বাঁদর খেলা, কাঠপুতলির নাচ—দুহাতে দুটো পুতুল নিয়ে নাচায় আর ছড়া কাটে— সে যা জমে না! লোকে হেসে কুটোপুটি। আর বসে খাবারের দোকান। বড় থালার মতো একটি জিলিপি ভেজে রসে চুপচুপে করে ভিজিয়ে দোকানের সামনে টাঙিয়ে দেয় জিলিপিওলা। সনাতনের ইচ্ছা ওই জিলিপিটা খাবে। তা দোকানিকে জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁগো, ওই জিলিপিটার দাম কত? তা দোকানদার বলল—ওটা বিক্রির নয়। ওটা এ্যাটভাটাইজ!

—এ্যাটভা—কি বললে? সনাতন বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল।

—এ্যাট ভাটাইজ, এ্যাটভাটাইজ বোঝো না? এ্যাটভাটাইজ মানে আবার কি, এ্যাটভাটাইজ মানে এ্যাটভাটাইজ—মানে প্রচার, ওটা দেখে লোকে দূর থেকেও বুঝতে পারবে জিলিপির দোকান।

—অ! সনাতন হাঁ করে বলল।

দোকানের বেঞ্চিতে বসে দাড়িওলা এক ভদ্রলোক জিলিপি খাচ্ছিলেন, আঙুল

চাটতে চাটতে বললেন—ওটা ইংরাজি কথা। বুঝলে না, হারু ঘোষ ইংরাজি বলেতো, বাংলাটা ঠিক জানে না, কথাটা হচ্ছে এ্যাডভারটাইজ—মানে বিজ্ঞাপন। তা হ্যাঁ হারু, জিলিপির ইংরাজি কি বলতো?

—কি যে বলেন মাস্টারমশাই! দোকানদার হারু ঘোষ লজ্জা লজ্জা করে বলে—আমি ইংরিজি বলব?

সনাতন এগোয়। মাস্টারমশায় ডাকেন—ও ভাই, আরে বড়টা যদি না পাও তাতে কি, ছোট জিলিপি দুচারটে খাও, একই তো হলো।

সনাতন ফিরে আসে। মাস্টারমশাই বলেন, জিলিপির মতো লোভনীয় জিনিষ আর কি আছে বলো! এই দেখো না , প্রত্যেক শুক্রবার হাটে আসি হাট করতে নাকি হারু ঘোষের জিলিপির প্যাঁচে পড়ে তাই বুঝতে পারি না। খাও, খাও, প্রাণটা যখন চেয়েছে ছোটই খাও। ওই একই তো জিনিষ।

হারু ঘোষ দুগণ্ডা—মানে আটটা জিলিপি শালপাতার ঠোঙা করে এগিয়ে দেয়, যে মানুষটা এত বড় থালার মতো জিলিপিটা খেতে চেয়েছে তাকে তো আর দুতিনটে দেওয়া যায় না!

সনাতন বেঞ্চিতে বসে জিলিপি চিবুতে চিবুতে পরম আরামে বলে—তা যাই বলুন মাস্টারমশাই, বড়র স্বাদ আর ছোটর স্বাদ কি এক হয়? চার কিলো সাইজের পাকা রুই আর চারশো গ্রামের পোনা রুই কি আর একরকম খেতে?

—বাহবা! বাঃ! বাঃ! বেশ কথাটি বলেছো তো! তুমি বড় খাদ্যরসিক হে! তা থাকা হয় কোথায়?

সনাতন তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে হারুর হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ব্যস্তভাবে বলে —ওই শিবু পাল মশায়ের আড়তে— বলতে বলতে ফেরত খুচরো না গুনেই পকেটে ফেলে হন্‌হন্ করে এগিয়ে যায়। কি কথা থেকে কি কথা বেরিয়ে পড়বে।

ঘুরতে ঘুরতে কামারের দোকান খোঁজে সনাতন। একটা শাবল কিনতে হবে। বেশি বড় হলে চলবে না। নিয়ে ঘোরা মুশকিল। এই হাতখানেক লম্বা, বেশি মোটাও নয়, অথচ ফলাটা বেশ ধারালো।

খুঁজতে খুঁজতে দোকান পেয়ে যায় সনাতন। কিন্তু সব বড় বড় শাবল। অত বড় শাবল নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া ওজনেও ভারী।

—কি কাজে লাগবে হাতখানেক সাইজের শাবল? দোকানী জিজ্ঞাসা করে।

সনাতন মনে মনে তড়পায়, তোমার অত কিছুর জানার দরকার কি বাপু! কিন্তু সে কথা তো বলা যায় না। একটু তফাতে একটা লোক শিকড়বাকড় বিক্রি করছিল, হঠাৎ সনাতনের মনে হল—তাই তো খুব ভালো কথা মনে হয়েছে, বলল—ওই গাছপালার গোড়া আলগা করে শেকড়বাকড় তুলব আর কি! বড় শাবলে তো ওসব কাজ হয় না।

—ওরকম জিনিষ তুমি এখানে পাবে না—দোকানদার বলল, সুজনপুরের রথের মেলায় অনেক দোকান বসে। ওখানে হরেক জিনিষ পাওয়া যায়। এই তো আর কদিন বাদেই রথ, ওখানে যাও না, রথও দেখা হবে, জিনিষও পেয়ে যেতে পারো।

কথাটা মন্দ নয়—সনাতন ভাবল। কিন্তু সুজনপুর কোনদিকে—এসব ওকে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না। ভাববে কোথাকার লোকরে বাবা? ও কথা আড়তে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই হবে।

অমন শাবল একটা জোগাড় করতেই হবে। ওটা ব্যাগে পুরে বগলে নিয়ে জঙ্গলে শেকড়বাকড় খুঁজতে যেতে হবে। যদি কারো নজরে পড়ে? কিছু জিজ্ঞাসা করে? লাগসই একটা জবাব পাওয়া গেল।

ঘুরতে ঘুরতে হাটের বাইরে চলে এল সনাতন। এখানে অনেক সাইকেল ভ্যান জুটেছে। মালপত্র নিয়ে লোক বসছে সাত-আট জন, চলে যাচ্ছে দূর দূর গ্রামে। কেউ হাঁকছে সোনাখালি, কেউ হাঁকছে শিমুলতলা, ওই তো একজন হাঁকছে পঞ্চসায়র। বুকটা ধড়াস করে উঠল সনাতনের, পরক্ষণে শান্ত হয়ে চিন্তা করল কোনো একটা হাটের দিনে সাইকেলভ্যানে গেলে হয়। ছুটির দিনও বটে, তাড়াতাড়ি যাওয়াও যাবে। কিন্তু না, তাকে যেতে হবে সকাল সকাল, ভ্যান তো আর সকাল সকাল ছাড়বে না। হাট করে তবে তো লোক যাবে। হাটের দিনই যেতে হবে তাকে। কিন্তু ভোর ভোর বেরোতে হবে। সেই ভালো।

৯

দেখতে দেখতে আষাঢ় মাস এসে গেল। দুদিন পরেই রথ। গরমের ছুটির দুপুরে দু একটা ছোটখাট অভিযান হলেও সাহস করে ওরা দূরে কোথাও যায়নি। কিন্তু আজ টিফিনের সময় নারাণ বলল—এই রাজু, সুজনপুরে রথ দেখতে যাবি?

সুজনপুরের রথের কথা শুনেছে রাজু। সে নাকি বিরাট রথ। সেখানে মেলাও বসে বিরাট। থাকে সোজারথ থেকে উল্টোরথ পর্যন্ত। সে মেলায় কত রকমের যে মজা! কত রকমের খেলা, নাগরদোলা, ঘোড়াদোলা, আর কত রকমের খাবার। নারাণের কথা শুনে তার বুক নেচে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। সে যে অনেকদূর! বেলাবেলি বেরোলেও ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

—নারে, রাত হবে না, একটা ব্যবস্থা যদি করা যায়।

—কি ব্যবস্থা?

—যদি একটা সাইকেল ম্যানেজ করা যায়—নারাণের বুদ্ধি—তুই পিছনে বসবি, আমি চালিয়ে নিয়ে যাবো।

—তুই কারো থেকে জোগাড় করতে পারবি? রাজু বলে।

—আমাকে কে সাইকেল দেবে? এর ওর থেকে চেয়ে কত কষ্টে যে চালাতে শিখেছি। কিন্তু অত দূরে ঘুরতে যাওয়ার জন্য কেউ দেবে না।

—তাহলে আর কি করে হবে—রাজু অবাক হয়।

—হবে, হবে, তুই যদি চুপি চুপি বিশুদার সাইকেলটা বার করে আনতে পারিস, ব্যস, তারপরে আর পায় কে!

—কিন্তু তারপর? বিশুদা যখন সাইকেল দেখতে না পেয়ে খুঁজবে? ভাববে চুরি হয়ে গেছে, চেঁচামেচি করবে, দাদুকে বলবে।

—অত ভাবলে হয় না—নারাণ বলে, বেরিয়ে পড়তে হবে। মজা করে ফিরে এলে তখন হয়তো বকুনি খেতে হবে। তোকে তো মারবেনা রে। ওরকম কত মার আমি খেয়েছি! ফুঃ!

দুজনে গভীর পরামর্শ চলে—বিশু কোথায় সাইকেল রাখে, চাবি দেয় কি না, দুপুরে কতক্ষণ ঘুমোয়—

রাজু দেখেছে বিশু দিনেরবেলা সাইকেলটা নিচের বারান্দায় রাখে এবং চাবি দেয় না। দুপুরে বিশু যখন ঘরে ঘুমায় তখন অনায়াসে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়। নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

রথের দিন রাজু খিদে পেয়েছে খিদে পেয়েছে করে তাড়াতাড়ি খেতে বসল বটে কিন্তু ভালো খেতে পারল না। উত্তেজনায় ভেতরটা যেন ফুটছে। নিজের ড্রয়ারে গোটা কুড়ি টাকা জমেছিল সেগুলি গুছিয়ে নিল। ঠাকুমা স্কুলে যাওয়ার সময় তাকে দু এক টাকা দেন। খাতাটা পেন্সিলটা রাবারটা যদি কিনতে হয়, কিংবা কিছু কিনে খেতে ইচ্ছা যায়। তা থেকে কুড়ি টাকা জমেছিল।

নারাণ অবশ্য বলেছে তার কাছে মাত্র তিন টাকা আছে। রাজু বলেছে তোকে কিছু খরচ করতে হবে না। নারাণ বলেছে—না, না, তা কেন? কম আছে আমার কমই খরচ করব।

অতঃপর দাদু শুয়েছে, ঠাকুমা শুয়েছে, বিশু শুয়েছে, তারপর দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা। কখন নারাণের পাখির ডাক শোনা যাবে! ওই—শোনা গেল পাখির ডাক।

সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে বারান্দা পেরিয়ে সামনের বাগানে—বাগানের রাস্তাটুকু পেরিয়ে গেট দিয়ে বেরোতে রাজুর মনে হচ্ছিল সে কতকাল ধরে সাইকেলটা ঠেলছে। রীতিমতো ঘেমে গেল।

যাক, বিনা বাধায় অবশেষে পথে, নারাণ এগিয়ে এসে সাইকেলে উঠল, রাজু পিছনের ক্যারিয়ারে বসল, দু একবার একটু টালমাটাল, তারপর সাঁইসাঁই ছুট। আহ্! কি মুক্তি! কি আনন্দ! নারাণ হিহি করে হাসছিল, রাজুও হেসে উঠল।

মেলায় পৌঁছে রাজু বলল—সাইকেল নিয়ে কি করে ঘোরা হবেরে?

—দূর বোকা, দেখ না সাইকেল জমা রাখা হয়। একটা টিকিট দেবে নম্বর লেখা, ফেরত নেবার সময় ওই টিকিট ফেরত নিয়ে সাইকেল ফেরত দেবে। একটাকা নেবে। আমি সব খবর নিয়েছি। কত লোক যাচ্ছে, পায়ে পায়ে হেঁটেই চলেছে সব, দুচারজন সাইকেলে।

ওদের জিজ্ঞাসা কর না।—রাজু বলল।

—দেখ না ঠিক খুঁজে নেবো, ওদের পিছু পিছু যাই, বেশি জিজ্ঞাসা না করাই ভালো, কে কিভাবে বোকা বানিয়ে দেবে। এসব জায়গায় অনেক বদমাইশ লোক ঘোরে, খুব সাবধান, পকেট সামলে রাখিস।

রাজু একবার প্যান্টের পকেটে ওপর থেকে হাত বুলিয়ে নিল—ঠিক আছে।

একটা জায়গা বাঁশ দিয়ে ঘিরে সাইকেল রাখার জায়গা, সেখানে কয়েকজন লোক তদারক করছে। ঢোকার মুখে গেট করেছে, সাইকেল নিয়ে ঢোকার সময় একটা টিকিট আটকে দিচ্ছে সাইকেলে, আর একটা একই নম্বরের দিচ্ছে হাতে। ভেতরের লোক সাইকেল নিয়ে সারিতে রেখে চাবি আটকে চাবিটা নারাণের হাতে দিয়ে দিল। এই প্রথম রাজু শিখল সাইকেলের তালা বন্ধ করলে তবে চাবিটা খোলা যায়, নাহলে তালা খোলা অবস্থায় চাবি আটকে থাকে তালার গর্তে।

—ভারি মজা তো! রাজু বলল।

চাবির সঙ্গে বিশু কেমন সুন্দর একটা শাঁখ ঝুলিয়েছে। ওটা দেখতে দেখতে রাজু বলল, নারাণ সাইকেল হারিয়ে যাবে না তো?

—এই যে খোকা, শোনো—যে লোকটি সাইকেল সারিতে লাগাচ্ছিল বলল—বারো বছর আমরা এখানের মেলায় সাইকেল জমা রাখি, কেউ বলতে পারবে না কোনোদিনও একটা সাইকেল এদিক ওদিক হয়েছে, বুঝলে?

রাজু বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল।

রথ দেখে দুজনে অবাক। কি বিরাট রথ। তিনতলা রথের মাঝের তলায় জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা, গোটা রথটা দেবদারু আর রঙিন বাহারি পাতা, ফুল, রঙিন কাগজের পতাকা দিয়ে সাজানো। বড় বড় দুটি কাঠের ঘোড়া লাগান, আবার চাবুক হাতে সারথি। সারথির গোঁফ দেখে রাজুর কিহাসি!

—রথের দড়ি ধরে একটু টানতে হয়। নারাণ বলল।

দুজনে এগিয়ে গেল। শয়ে শয়ে লোক মোটা দড়ি ধরে টানছে। দুজনে ঠেলেঠুলে ঢুকে প’ড়ে রথের দড়ি ধরে দু পা এগোলো। কি ঠেলাঠেলি, রাজু পড়েই যাচ্ছিল, নারাণ ধরে ওকে বার করে আনল।

তারপর নাগরদোলায় চাপা। ওপরে উঠছে নিচে নামছে চারটে দোলা, ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর আওয়াজ হচ্ছে। দুজনে উঠল। ওরে বাবা, পেটের মধ্যে একি গুরগুরুনি! কখন থামবে? ওরে বাবা, আর পারছি না যে! —নারাণ চ্যাঁচাচ্ছিল, রাজু মুখ বন্ধ করে কান লাল করে একেবারে অস্থির। তারপর ফুচকা—দেখেই জিভে জল। দুজনে দাঁড়িয়ে গেল, শালপাতার ঠোঙা এগিয়ে দিল ফুচকাওয়ালা।

—একটা ছোট ভাঁজ করা ছুরি কত দাম হবে বলতো? ফুচকা চিবুতে চিবুতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল নারাণ।

—ছুরি! ছুরি কি হবে? রাজু জিজ্ঞাসা করল।

—একটা ছোট ছুরি অনেক কাজে লাগেরে। নারাণ বলল। —যেমন ধর, গাছে বসে বসে কাঁচা আম, আমড়া কেমন কেটে কেটে খাওয়া যায়। তারপর ধর ঘুড়ির কাঠি, কাগজকাটা, কত রকমের কাটাকুটি।

—আমার কাছে তো টাকা আছে, চল না গিয়ে দর করি।

দুজনে খুঁজে খুঁজে কামারের দোকানে হাজির।

—ভাঁজকরা ছোট ছুরি আছে? নারাণ জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ আছে। বলতে বলতে সুন্দর একটা ছুরি এগিয়ে দিল দোকানদার।

—খুব সুন্দর নারে! ছুরিটা হাতে নিয়ে বলল নারাণ। খুলে বন্ধ করে দেখতে লাগল। —একটা ছোট ছুরি হাজার কাজে লাগে—বলল সে।

উবু হয়ে বসে শাবল দেখছিল সনাতন, ছোট ছুরির খদ্দেরের কথা কানে আসছিল, নারাণের শেষ কথাটা শুনে বুকের ভেতরটা আইঢাই করে উঠল—ঠিক বলেছ ভাই, অমন কাজের জিনিষ আর দুটি নেই—বলতে বলতে মুখ তুলে দেখতে চাইল ছুরির ক্রেতাকে।

তাকিয়ে চোখে চোখ—চট করে মুখ নামিয়ে নিল সনাতন। তাড়াতাড়ি দাম মিটিয়ে শাবল হাতে নিয়ে দ্রুত পা চালাল। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠেছে—ও তো সেই বাঁদর ছেলেটা, গাছ থেকে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল।

একটু দূরে গিয়ে একটা দোকানের আড়াল থেকে দেখল ছেলেটি এদিকেই তাকিয়ে আছে, দৃষ্টিটা কেমন সন্দেহের। সট্ করে সরে গেল সনাতন, হঠাৎ চোখে

পড়ল একটু দূরে একটা দোকানে এ্যাডভাটাইজ—থালার মতো বড় জিলিপিখানা ঝুলছে। আহাহা! চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তেমনি সনাতনকে টেনে নিল জিলিপি চক্র।

দরদস্তুর করে আট টাকায় কেনা গেল ছুরি। খুব খুশি নারাণ। দামটা রাজু দিতে পেরে রাজুও খুশি। বন্ধুর এমন আনন্দিত মুখ সে আগে দেখেনি।

—চল্‌তো একটু ওদিকটা—হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় নারাণ বলল—ওই লোকটা—

—কোন লোকটা? কি?—রাজু অবাক হয়ে বলল।

—চল্ না—

সনাতনকে এ দোকানদার কিন্তু জিলিপিটা বিক্রি করতে রাজী হয়ে গেল। অবশ্য দশ টাকা দাম চাইল। তা চাকগে! অমন একখানা জিলিপির দাম দশ টাকা হবে না? এখন শিবু পালের আড়তে কাজ করে সনাতনের রোজগার তো জমেই যাচ্ছে। যদি ভোগে না লাগল তবে কিসের জন্য রোজগার! সনাতন জিলিপিটি নিয়ে জমিয়ে বসে খেতে লাগল তারিয়ে তারিয়ে। আর সেই দৃশ্যই অবাক হয়ে দেখছিল রাজু আর নারাণ।

এইরে! ছেলে দুটো আবার! সনাতন ঘুরে পিছন ফিরে বসল।

এমন সময় জিলিপি কিনবে বলে পয়সা বার করার জন্য পকেটে হাত দিয়ে রাজু হঠাৎ—সাইকেলের চাবি কোথায় গেল? বলে এ পকেট ও পকেট হাতড়াতে শুরু করে দিল।

—তোর কাছে নাকিরে নারাণ?

—আমি তো তোকে রাখতে দিলুম।

—দেখ তবু তোর পকেটে আছে নাকি? রাজু কেঁদে ফেলবে বুঝি, মাথা ঘুরছে।

নারাণ নিজের পকেট তবু দেখল, না নেই।

মুখ শুকনো হয়ে গেল দুজনের।

—কি হল খোকা? দোকানদার জিজ্ঞাসা করল।

—সাইকেলের চাবি হারিয়ে গেছে। নারাণ বলল।

—কোথায় কোথায় গিয়েছিলে? সেসব জায়গায় দেখ। কোথায় থাকো তোমরা?

—সেই পঞ্চসায়রে। বলতে বলতে নারাণ রাজুর হাত ধরে মাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে এগিয়ে চলল। রাজুকেও বলল ভালো করে দেখতে।

—আচ্ছা, আমরা যখন রথ টানছিলাম তখন পড়ে যায়নি তো? নীচের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতেই কথা বলছিল নারাণ।

—না মনে হয়, যখন ফুচকা খেলাম তখনও মনে হল পয়সা বার করার সময় হাতে ঠেকল।

—তাহলে নাগরদোলার ওখানে?

—বোধহয় ওখানেই রে—

সার্কাসের তাঁবুর সামনে বড় বড় ছবি বাঘ সিংহ আর হাতির। কিন্তু সেসব দেখবার মতো কোনোরকম ইচ্ছাই জাগছে না। ওদিকে আরেকটা তাঁবুর সামনে একটা লোক একটা কাঠির মাথায় আগুন জ্বেলে মুখে পুরছে আর বার করছে—সেদিকে এক পলক তাকিয়েও চোখ ফিরিয়ে নিল রাজু। তার কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছিল।

নাগরদোলার ওখানে চারটে নাগরদোলা ঘুরপাক খাচ্ছে।

—কোনটাতে আমরা উঠেছিলাম বল তো? নারাণ জিজ্ঞাসা করল।

—ওই লাল সবুজ রঙেরটা?

—না, না, ওই লাল হলদেটা, আমার যখন মাথা ঘুরছিল আমি লাল হলুদ দেখেছিলাম।

লালহলুদ রঙের নাগরদোলার কাছে গিয়ে ওরা মাটিতে চোখ রেখে খুঁজতে লাগল।

—আরে আরে এই খোকা, সরে যাও, ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে যে। আরে কি করছ? নাগরদোলা ঘোরাচ্ছিল যে লোকটা সে বলল।

—আমাদের সাইকেলের চাবি হারিয়ে গেছে, একটু থামাও না ভাই, ভালো করে দেখি।

—কিরকম চাবি? —ওর সাগরেদ যে পয়সা নিচ্ছিল সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল।

—চাবিতে একটা ছোট শাঁখ লাগানো আছে।

—তাই নাকি? হাসল সাগরেদ। তাহলে শাঁখকে জিজ্ঞাসা করো—এই শাঁখ কোথায় আছিস? শাঁখ পুঁ করে আওয়াজ দেবে।

লোকটির হাসি দেখে নারাণের মনে হল হয়তো ও কুড়িয়ে পেয়েছে।

—তুমি পেয়েছ ভাই? —নারাণ খুব মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

—কি জানি? একটা চাবি পেয়েছি, যদি তোমাদের হয় তাহলে—

—কই দেখি দেখি, দুজনেই বলে উঠল।

সাগরেদ পকেটে হাত দিয়ে বলল—দেখলে হবে? খরচা আছে।

—খরচা মানে? নারাণ অবাক!

—তোমরা বেখেয়ালে চাবি হারিয়ে ফেলবে, আর আমি খুঁজে রাখবো, তার জন্য খরচা লাগবে না?

—দাও না ভাই, কেন অমন করছ, আমরা ছেলেমানুষ—

—ছেলেমানুষ বলেই তো কম খরচা, বড় মানুষ হলে দুশ টাকা নিতুম। ছেলেমানুষ—হাফ টিকিট—হাফ খরচা—তোমরা একশ টাকাই দিও।

—ওরে বাবা! —রাজু কেঁদে ফেলল —অত টাকা আমরা কোথায় পাব? এক-শ-টাকা!

—তাহলে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাও—মিচকি হেসে বলল সাকরেদ।

—এই পাঁচু, কেন বাচ্চা ছেলেকে কাঁদাচ্ছিস? যদি পেয়ে থাকিস দিয়ে দে। ধমক দিল দোলাওয়ালা।

—বারে আমি কষ্ট করে তুলে রাখলুম, আর মজুরি নোবো না?

—মারব এক রদ্দা। দিয়ে দে ব্যাটা।

—ঠিক আছে, তোমার কথাও থাক আমার কথাও থাক। একশ টাকা না থাকে একশ পয়সার একটা পাঁপড় ভাজা কিনে আনো।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাজু দাঁড়া—বলে নারাণ দৌড়ে একটা পাঁপড় কিনে আনল।

পাঁপড়ে কামড় দিয়ে পাঁচু পকেট থেকে শাঁখওলা চাবি বার করে রাজুর হাতে দিয়ে বলল—সব জিনিস সাবধানে রাখতে শেখো, কি বুঝলে? হ্যাঃ! হ্যাঃ! এটা হলো ফাইন, মানে জরিমানা। বুঝলে? বলে আবার একটি কামড় পাঁপড়ে। রাজু নারাণ ততক্ষণে হাওয়া।

চাবি পেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেল দুজনে।

—আর ঘুরে কাজ নেই নারাণ—রাজু বলল। অনেক দেরি হয়ে গেছে, চল এবার ফিরে যাই।

বিশুবাবু দিবানিদ্রা সেরে হাই তুলতে তুলতে বারান্দায় এলো তার মখমলের টুকরো হাতে নিয়ে। এ সময় সে রোজ একবার সাইকেলের সেবা করে। আহা, সাইকেলটা তাকে কত কষ্ট করে বহন করে, তাকে সেবাযত্ন না করলে হয়? এটা হল বিশুর মানবিকতা। বারান্দায় এসে সে দেখল বারান্দা ফাঁকা। চোখকে বিশ্বাস হয় না, দুচোখ কচলাল বিশু, ঘুম কি এখনও ভাঙেনি? কিন্তু না, ঠিকই দেখছে সে, সাইকেল নেই।

—চুরি, চুরি, সাইকেল চুরি হয়ে গেছে, ও কত্তাবাবা, ও বড় মা, আমার সাইকেল চুরি হয়ে গেছে। বাড়ি মাথায় করে চেঁচাতে শুরু করল বিশু।

ইন্দ্রনাথের দিবানিদ্রা হালকা। অর্ধঘুম অর্ধ জাগরণ। দুপুর গড়িয়ে গেলে বিশু তামাক সেজে আনে, গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে নলটি হাতে নিয়ে ডাকে— কত্তাবাবা, উঠুন। ইন্দ্রনাথ উঠে ইজিচেয়ারে বসেন তামাকু সেবন করেন। জমিদারী মেজাজের এটুকু তিনি বজায় রেখেছেন। ঝকঝকে তকতকে গড়গড়াটি তার প্রিয়, আর প্রিয় এই আরামকেদারা।

আজ কিন্তু বিশুর মোলায়েম ডাকের পরিবর্তে চিৎকার চেঁচামেচি কর্ণে প্রবেশ করে অস্থির করে তুলল। তিনি উঠে বসলেন।

বিশু জোড়া জোড়া সিঁড়ি টপকে উঠে এসে, ইন্দ্রনাথের সামনে হাঁউমাঁউ করে কি বলল ইন্দ্রনাথ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

—কি হলো কি? থির হয়ে ভালো করে বলবি তো? ইন্দ্রনাথ ধমকালেন।

—এ বাড়িতে চোরের মচ্ছব লেগেছে। এই সেদিন মন্দিরে চুরি হল, আজ আমার সাইকেল চুরি হয়েছে।

—চাবি দিয়ে রাখিসনি?

—না, রোজই এমনি থাকে।

—তাহলে তো ভালোই, চোরের সুবিধা করলে চোর নেবে না? সকলকে বলেছি সাবধানে থাক, একবার যখন চুরি শুরু হয়েছে চোর সুযোগ সুবিধে পেলেই আবার নেবে।

এসময় উমারানী এসে দাঁড়ালেন—রাজু কোথায়? —জিজ্ঞাসা করলেন।

—কেন? —ইন্দ্রনাথ অবাক।

—তাকে কোথাও দেখছি না, ঘরে নেই, বাগানে নেই, পুঁটির মা বলছে খোকাবাবু সাইকেল ঠেলে নিয়ে বেরোচ্ছিল দেখেছে, দেখত বিশু বাইরে কোথাও মাঠে গিয়ে হয়তো চালাতে শিখছে।

—সে তো আমাকে বললেই হতো—বলতে বলতে বিশু দৌড়ল।

—আমার তামাক? —ইন্দ্রনাথ বলে উঠলেন—কিন্তু বিশু শুনতেই পেল না।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এল বিশু, না দেখা যাচ্ছে না, না সাইকেল, না রাজু।

—তাহলে রাজুই কোথাও গেছে সাইকেল নিয়ে—ইন্দ্রনাথ বললেন।

—কিন্তু ও তো চালাতে জানে না—বিশু প্রতিবাদ করে।

—জানি না সব কি হচ্ছে! দে আমার তামাক সেজে দে আগে, তারপর দেখা যাবে কি সব হচ্ছে, ওঃ! মাথাটা ধরে গেল।

অতঃপর গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিশুর হাহুতাশ আর পায়চারি।

মজা পুকুরের ওপার থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে রাজু দেখতে পেল, নারাণকে বলল—নারাণ, এখানে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুই চলে যা, গেটের কাছে বিশুদা দাঁড়িয়ে আছে, আমি সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাই।

—তোকে একা ফেলে চলে যাবো? দুজনে ভাগ করে বকুনি খেলে ভাগে কম হবে।

—না না, সে আমি বুঝব, তুই যা।

অগত্যা নারাণ সাইকেল রাজুকে দিয়ে চলে গেল। রাজু সাইকেল নিয়ে গেটের কাছে আসতে না আসতে বিশু একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাইকেলটা নিয়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগল অমন যত্নের ঝকঝকে শরীরে কোথাও আঘাত লেগেছে কি না।

—কোথায় গিয়েছিলে সাইকেল নিয়ে? নারাণকে দেখলাম মনে হচ্ছে চালিয়ে নিয়ে এল?

ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলো বিশু?

ততক্ষণে বিশু সাইকেল ঠেলে ভেতরে, পিছনে রাজু, বিশু মুখ তুলে বলল—নারাণের সঙ্গে সাইকেলে কোথায় যেন গিয়েছিল খোকাবাবু। তাইতো বলি, খোকাবাবু তো সাইকেল চালাতে জানেই না! এসব ওই পাজি নারাণের মতলব কত্তাবাবা।

—ওপরে এসো রাজু,—দাদু বললেন—বিশুও এসো।

ওপরের বারান্দায় বিচার সভা, উমারানীও এসে দাঁড়িয়েছেন।

—কোথায় গিয়েছিলে—গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ইন্দ্রনাথ।

দাদুর এরকম কণ্ঠস্বর রাজু কখনও শোনেনি, সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

উমারানী তাড়াতাড়ি রাজুর কাছে এসে ওকে টেনে নিয়ে বললেন—বকছ কেন?

—বকলাম কোথায়? আমি তো জিজ্ঞাসা করছি কোথায় গিয়েছিল।

—কোথায় গেছিলি রাজু? —উমারানী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন।

—রথের মেলায়—রাজু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উত্তর দিল।

—ও মা! সেই সুজনপুর? কি দস্যি হয়েছিসরে! যদি হারিয়ে যেতিস।

—তুমি অনেকগুলো অন্যায় একসঙ্গে করেছ—ইন্দ্রনাথ বললেন—এক : বিশুকে না বলে বিশুর সাইকেল নিয়েছ, দুই : আমাদের না বলে বেরিয়েছ, তিন : অতদূরে অজানা অচেনা জায়গায় অত ভিড়ের মধ্যে গেছ, অনেক কিছুই ঘটতে পারত, চার : সাইকেলে দুজন, তোমরা ছোট ছেলে, পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙতে পারতো—এতসব অন্যায় তুমি করলে?

—আহা, না বলে গেলে তুমি বুঝি ওকে যেতে দিতে? —উমারানী বললেন— ও তো বড় হচ্ছে, ঘুরতে বেড়াতে ইচ্ছা হয়, তুমি কি ওকে কোথাও নিয়ে যাও?

—এসব ওই নারাণের মতলব বড় মা, —বিশু বলল—খোকাবাবুর মাথায় এত দুষ্টুমি আসবে না, ইস্কুলের ক্লাসে বসে বসে মতলব দেয়।

—যাও, নারাণকে ডেকে আনো —বিশুকে বললেন ইন্দ্রনাথ—ওরা একসঙ্গে পড়ে বুঝি?

—হ্যাঁ।

বারান্দার বিচার সভায় নারানের হাত ধরে টানতে টানতে উঠে এলো নারাণের বাবা গগন, পিছনে বিশু। নারাণকে ইন্দ্রনাথের সামনে দাঁড় করিয়ে দুই চড় লাগাল। বোঝা গেল আগেও কয়েক ঘা দেওয়া হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ হাঁ হাঁ করে উঠলেন—এ কি? তুমি ওকে মারছ কেন?

—মারব না? বিশুর মুখে সব শুনে আমি তখনই ওকে এক দফা দিয়েছি, এখন আপনার সামনে দেখুন ওর কি অবস্থা করি—

—খবরদার—ইন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন—থমকে গেল গগন।

—কিন্তু দেখুন বড়কত্তা—গগনের গলা একেবারে নেমে মিউমিউ—ও ডানপিটে বাঁদর টো টো করে ঘোরে, এর গাছে ওর গাছে বাঁদরামি করে বেড়ায় তা করুকগে মরুকগে কিন্তু অমন শান্ত সরল ভালো ছেলেকে দলে টানবে? বদ মতলব দেবে?

—বিশু আমি শুধু নারাণকে ডাকতে বলেছিলাম, ওর বাড়িতে গিয়ে এত কথা ওর বাবাকে বলতে বলেছিলাম কি? —ইন্দ্রনাথ রাগত স্বরে বললেন—কি বললাম আর কি হয়ে গেল, এ তো আমাকে এই বাচ্চা ছেলেটার কাছে দস্তুরমতো অপমান করলি তুই। ছিঃ, ছিঃ ছিঃ! আমি ওকে বোঝাব বলে ডাকতে পাঠালুম, আর তোরা—আঃ, যা আমার সমুখ থেকে, যা, যাও গগন—

সবাই হুড়মুড় করে চলে যাচ্ছিল, ইন্দ্রনাথ বললেন—নারাণ, তুমি দাঁড়াও।

—নারাণ অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়াল।

—কিছু মনে কোরো না তুমি—ইন্দ্রনাথ বললেন—আমি তোমাকে মারতে বলিনি, তোমাকে ডাকতে বলেছিলাম কিছু কথা বলব বলে।

নারাণ মাথা নিচু করে নিল।

—এত দূরের রাস্তা তুমি একা চালিয়ে নিয়ে গেলে এলে?

নারাণ আস্তে ঘাড় নাড়ল।

—বাঃ! তোমার গায়ে তো খুব জোর! কিন্তু শোনো, এরকমভাবে কাউকে না বলে পরের জিনিস নিয়ে যাওয়া অন্যায়। বললে তোমাদের যেতে দিতাম না, এটা ঠিক। কিন্তু তবুও অন্যায় করা উচিত নয়, বুঝেছ?

নারাণ আলতো ঘাড় নাড়ল, বুঝেছে।

—উমা, ওকে কিছু খেতে দাও।



১০

আজ শুক্রবার

আজ হাটবার।

আজ আড়ত বন্ধ। আজ ছুটি।

গতকাল রাত্রে আটটা না বাজতেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছিল সনাতন। আজ এখন ভোর চারটে, ঘুম ভাঙতেই উঠে পড়ল, দীঘিতে স্নান করে এল, তারপর পান্তা ভাতে পেট ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। হাতে তার ডোরাকাটা নাইলনের একমাত্র রেশন ব্যাগ। ব্যাগটি সে কদিন ধরে গুছিয়েছে। ওতে আছে প্লাস্টিকের প্যাকেটে বাঁধা এক প্যাকেট মুড়ি আর একটা প্যাকেটে শুকনো গুড়। এক শিশি কার্বলিক এ্যাসিড—এটা সে কিনেছে দোকান থেকে, গ্রামে সাপের উৎপাতের জন্য এটা লোকে কেনে। যখন সে লোকের আনাচে কানাচে রাতের বেলায় চুরি চামারি করতে বেরোতো তখন সে এটা শিখেছিল জুতোর তলায় আর পাশে কার্বলিক এ্যাসিড লাগিয়ে নিলে অন্ধকারে ওই বিশেষ প্রাণীটি কাছে ঘেঁসে না। এ্যাসিডের শিশি ভালো করে মুখ বন্ধ করে কাগজে মুড়ে সাবধানে ব্যাগের মধ্যে বসিয়ে গামছা দিয়ে দিয়েছে। ছোট শাবলটি নিয়েছে, আর ছোট ছুরিটা। দু'লিটার জলের বোতল যেটা তার সাথী সেটাও জল ভর্তি করে নিয়েছে। কয়েকটা মোমবাতি, দেশলাই আর আসল জিনিস—তাম্রপত্রটি গামছায় মুড়ে নিয়েছে। টাকাকড়ি কিছু নিয়ে বাকিটা আলমারিতেই রেখেছে।

জামাটা গায়ে দিতে গিয়েও দিল না সনাতন। ব্যাগে ভরে নিল। গায়ে জড়াল গামছা। আলমারিতে তালা দিয়ে ঘরে তালা দিয়ে দূগ্গা দূগ্গা বলে যখন বেরল সে তখনও অন্ধকার ভালো করে কাটেনি।

পঞ্চসায়র গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় আশুবুড়ির বাড়ির পিছনে যখন পৌঁছাল সনাতন তখন সকাল শেষ, ঝলমলে রোদ্দুর। ঝামেলার সেই আমগাছ—যেখানে

ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল বাঁদর ছেলেটা—সেটা একবার সন্দিগ্ধ চোখে দেখে অতি দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল চারিদিক— না কেউ কোথাও নেই। দ্রুতপদে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সনাতন, পায়ে চলা সরু পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে। বেশ কিছুটা এগিয়ে একটা বড় গাছের তলায় ফাঁকা দেখে বসল সে। একটু হাঁফ ছেড়ে ওপর দিকে তাকাল —জামগাছ।

সন্ন্যাসী দাদা বলেছিল এটা বেওয়ারিশ জঙ্গল। গ্রামের গরিব লোকজন কখনো সখনো জ্বালানির জন্য ডালপালা ভাঙতে জঙ্গলে ঢোকে, আর দুএকজন সাহসী ছেলে আম, জাম, কুল এসবের খোঁজে ঢুকে পড়ে। কেউ কিছু বলার নেই।

অতো ভাববার কিছু নেই, ভয় পাবারও কিছু নেই—নিজের মনকে নিজেই সাহস দিল সনাতন—তাছাড়া কেউ যদি এসেই পড়ে, যদি জিজ্ঞাসাই করে, উত্তর তো পড়েই আছে—গাছগাছড়া শেকড় বাকড় তুলতে এসেছি। নিজেকে চাঙ্গা করে তুলল সনাতন, তার হাত পা ঘাড়—সারা শরীরে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ, চোখে চিতাবাঘের সতর্কতা।

কার্বলিক এ্যাসিডের শিশি বার করে খুলে একটা কাঠি ডুবিয়ে জুতোর তলা আর পাশে এ্যাসিড লাগাল, শিশি বন্ধ করে ব্যাগে ঢোকাল। ছোট ছুরিটা বার করে দাঁড়িয়ে পড়ল, জামগাছটার গায়ে ছুরি দিয়ে গুণচিহ্ন খোদাই করল। এই পর্যন্ত রাস্তাটা সোজা এসেছে। এরপর দুভাগ হয়েছে। আরও সরু হয়ে হারিয়ে গেছে গাছপালার মধ্যে।

একটু ভেবে গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ঘূর্ণির মতো ঘুরিয়ে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল, পাতাটা ঘুরতে ঘুরতে পড়ল ডানদিকের পথে, নিশ্চিন্তভাবে সেদিকে পা বাড়াল সনাতন। কিছুদূর যাবার পর পথটা শেষ হয়ে গেল একটা ঝোপঝাড়ের সামনে।

এখানে একটা নাম না জানা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, ছুরি দিয়ে এ গাছের গায়েও চিহ্ন খোদাই করল সে তারপর শাবল বার করে ঝোপঝাড় ঠেঙিয়ে পথ করতে চাইল। হঠাৎ ঝোপ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো একটা কি— ছুটে পালাল, মুহূর্তে সনাতনের বুক ধকধক করে উঠল—একটা বেজি! হেসে ফেলল সে।

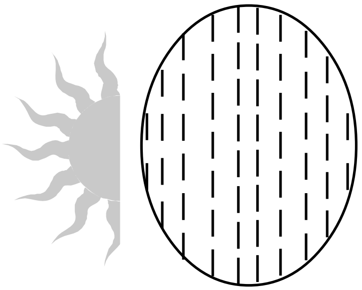
এভাবে ঝোপঝাড় ঠেঙিয়ে গাছের গায়ে চিহ্ন দিতে দিতে ঘন্টাখানেক জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একসময় সনাতন দেখল একটা ছোট নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে সে। হতাশ হয়ে পাড়ে বসে পড়ল। এই সেই নদী, সন্ন্যাসী দাদা বলেছিল জঙ্গলের শেষে দক্ষিণ দিকে বয়ে গেছে নদী। জমি একটু ঢালু হয়ে নেমে গেছে জলের ধারে, কিন্তু ও কী? নরম কাদার মধ্যে একটু দূরে বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে ইটের গাঁথুনির ভাঙা কিছুটা অংশ। উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সনাতন—তাহলে? সে কী পৌঁছে গেছে যথাস্থানে? প্রাণপণে ঝোপঝাড় সরিয়ে বাঁদিকে এগোতে লাগল এবং সহসা তার সামনে জঙ্গলাকীর্ণ বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ!

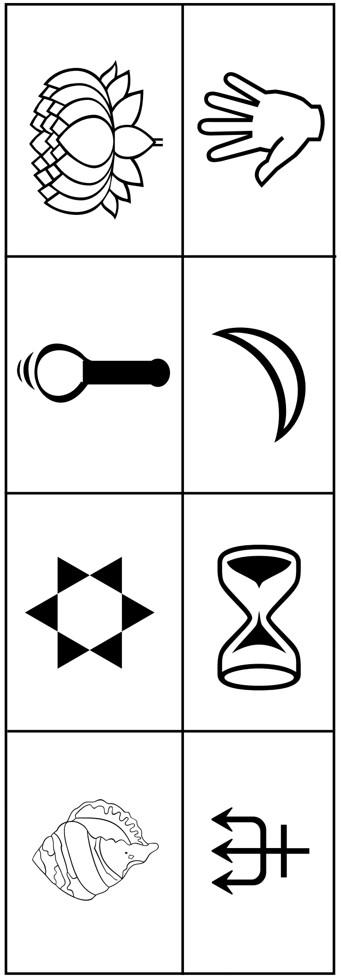
স্তম্ভিত সনাতন। তার পা যেন মাটিতে আটকে গেছে। তার সামনে বিশাল এক দীঘি যার চারদিকে চারটে ঘাট। যদিও মজা দীঘি এবং ঘাটগুলি ভেঙে চৌচির আর ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা তবুও বোঝা যায় তাদের বিশালত্ব। দীঘির ওপারে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ ধাপ সিঁড়ি যেগুলি বাড়িটির একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সিঁড়ির ওপরের চত্বরে বড় বড় থাম তার ওপর খিলান ধরে রেখেছিল ছাদ ও দ্বিতল, দ্বিতল ভেঙে দুমড়ে মুখ থুবড়ে পড়া বিশাল জন্তুর দেহ যেন, তার ওপর দীর্ঘকাল ধরে বেড়ে উঠেছে গাছপালা। বাড়িটির ওপাশের অংশ কিছুই নেই, কারণ দাঁড়িয়ে থাকা খিলানের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নদী।

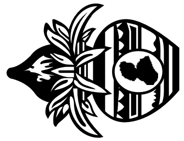
ওখানে যেতে গেলে দীঘির পাড় ধরে পরিক্রমা করতে হবে। আস্তে আস্তে যেন সাড় এলো, ডানদিক ধরে এগোলো সনাতন, অনেক কষ্টে ঝোপজঙ্গল ঠেলে সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়াল।

অজস্র ফাটলে ভরা ছোট ছোট ইঁটে গাথা সিঁড়ি, শ্বেত পাথরে বাঁধান ছিল বোঝা যায়, সাবধানে পা ফেলে ফেলে ওপরের চত্বরে এসে দাঁড়াল। সমগ্র প্রাসাদটি প্রায় একতলা সমান উঁচু চত্বরের ওপর দাঁড়িয়েছিল বোঝা যায়। কিন্তু এটা প্রাসাদের সম্মুখের অংশ—বাইরের মহল, প্রাসাদের বসবাসের আসল অংশ নদীর ভাঙনে তলিয়ে গেছে, তাই পিছনেই নদী দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারল সনাতন। সন্ন্যাসী দাদা বলেই ছিল অবশ্য একথা।

কিন্তু এখন কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না সনাতন, এতদিন জায়গাটা







খুঁজে বার করার জন্য মনপ্রাণ এক করে প্রস্তুতি নিয়েছিল সে, আর সেজন্য নানা পরিকল্পনা করে যথাসম্ভব নিখুঁত ছক করেছিল। সফলতা পেয়েছে সে। মনে এরকম একটা ধারণা জন্মেছিল জায়গাটায় পৌঁছতে পারলেই আসল সফলতা আসবে, হাতের মুঠোয় চলে আসবে গুপ্তধন, কিন্তু এখন এখানে পৌঁছে সে কিছুটা দিশাহারা। এখানে এই ভগ্নস্তূপে কোথায় লুকোনো আছে সেই সম্পদ, আদৌ আছে কিনা, থাকলেও তার অবস্থানের নির্দেশ কিভাবে দেওয়া আছে ওই তাম্রপত্রে? ভগ্ন চত্বরের মেঝেতে বসে পড়ল হতাশ সনাতন।

সূর্য এখন মাথার ওপর, সারা শরীর ঘামে জবজবে, গায়ের গামছা খুলে গা মুছল, এদিক ওদিক তাকিয়ে ছায়া খুঁজল। প্রাসাদের গায়ে বীরদর্পে বেড়ে উঠেছে বিশাল বটগাছ, শেকড়ের থাবায় ভেঙে দিয়েছে গাঁথুনির অহঙ্কার, সরে গিয়ে বটগাছের ছায়ায় বসল সনাতন, ভেঙে পড়লে চলবে না—ফিস্ ফিস্ করে নিজেকে বলল সনাতন—এতদূর যখন এসে পড়েছি বাকিটাও পারব, নিশ্চয় পারব, নিজেকে এভাবে বোঝাতে বোঝাতে ব্যাগ থেকে গামছা মোড়া তাম্রপত্র বার করে সামনে রাখল।

অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় সনাতনের চোখ জড়িয়ে আসছিল। এ সব ছবি তার মুখস্ত। ওপরের দিকে ছোট করে আঁকা একটা অর্ধেক চক্রের মতো, তার নিচে বড় করে আঁকা একটা গোল, তার নিচে দুই সারিতে চারটে করে আটটা ঘর কাটা। প্রথম সারিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও দ্বিতীয় সারিতে ত্রিশূল ডমরু অর্ধচন্দ্র এবং হাতের তালু, এইসব ছবিগুলি বন্ধ চোখের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে লাগল, আস্তে আস্তে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল সনাতন।

বজ্রপাতের তীব্র শব্দে যখন ঘুম ভাঙল তার ধড়মড় করে উঠে বসল সে, ঘুম তাকে সমস্ত চিন্তা ভাবনা ক্লান্তি থেকে দূরে এক শান্তির রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল। সে এখন কোথায়, কেন, এটুকু বুঝতে একটু সময় লাগল তার, তারপর চারপাশ এবং আকাশ দেখল।

সারা আকাশ জুড়ে কালো মেঘের দাপাদাপি। ঝড় উঠেছে, শুকনো পাতা

উড়ছে, গায়ে মুখে এসে আছড়ে পড়ছে, বিদ্যুৎ চিরে দিচ্ছে কালো মেঘের বুক, নেমে আসছে ভয়ানক শব্দে।

তার বাঁদিকে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একটা খিলান—ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছুটে তার ভেতর ঢুকে পড়ল সনাতন।

দিন এখনও শেষ হয়নি। শুধুই মেঘের অন্ধকার, তাই বাইরে সব কিছু দৃশ্যমান। বাইরের দিকে তাকিয়ে সনাতন দেখল দূরের জঙ্গল, তারপর দীঘি, তারপর সিঁড়ি, তারপর সামনের চত্বর। চত্বরে যেখানে সে বসেছিল সেখানে পড়ে আছে তাম্রপত্র। বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে। সনাতন ভাবল বৃষ্টিতে ধুয়ে যদি ওটার মধ্যে আরও কিছু নিশানা ফুটে উঠত!

ভিতরের চারপাশে তাকাল সে—এটা একটা ঘর ছিল মনে হচ্ছে। দোতলা ভেঙে গেলেও একতলার ঘরটি থেকে গেছে যদিও ফেটে যাওয়া ছাদ দিয়ে শিকড় নেমেছে নাকি গাছ শিকড় চালিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছে— সেসব জায়গা দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। দুএক ফোঁটা জল পড়ল সনাতনের মুখে আর তখন তার মনে হলো তৃষ্ণায় তার জিভ গলা শুকিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বোতল বার করে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে ফেলল সে।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি—মনে পড়ল তার, কিন্তু ক্ষুধার অনুভব একেবারেই নেই, সমস্ত শরীর জুড়ে কেমন একটা অবসাদ—শুধু ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশ পরিষ্কার। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বাইরে এসে তাম্রপত্র কুড়িয়ে নিল সনাতন, একবার ওটার দিকে আর একবার বাড়ির দিকে তাকাল। যদি সমস্ত বাড়িটাই ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখা যেত তাহলে আর এত চিন্তা ভাবনায় মাথা খারাপ করে ফেলতে হত না—ভাবল সে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, রাত্রি নামবে। এ নিয়ে চিন্তা নেই তার। ভয়ডর তার শরীরে মনে তিলমাত্র নেই। যখন চুরি চামারি করত তখন এরকম রাত সে মাঝে মাঝে নির্ভয়েই কাটিয়েছে। ওই ঘরেই রাত কাটাতে হবে। ঘরে ঢুকে সে মোমবাতি, দেশলাই আর এ্যাসিডের শিশি বার করল।

১১

অনেকবার নারান রাজুকে বলেছে একদিন তাকে নৌকো করে ঘুরতে নিয়ে যাবে। তাদের বাড়িটা নদীর ধারে। নদীতে তাদের একটা ছোট নৌকা বাঁধা থাকে। ওর বাবা ওটা নিয়ে একএকদিন নদীতে মাছ ধরতে বেরোয়। একদিন নদীর ধারে রাজুকে বেড়াতেও নিয়ে গিয়েছিল নারাণ।

রথের মেলার পর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে, সকলের মনে থিতিয়ে এসেছে মেলায় ঘুরতে যাওয়ার ঘটনা। এবার একদিন বেরিয়ে পড়া যেতেই পারে! শুক্রবার টিফিনের সময় দুজনে পরামর্শ হলো আগামী রবিবার দুপুরে বেরিয়ে পড়তে হবে। নারাণের পাখির ডাক আর বাগানের পিছনে ভাঙা পাঁচিলের ধারে অপেক্ষা করা ওসব তো আছে!

রবিবার-একেবারে স্কুল ভাতের সময়ে না হলেও ঠাকুমা ওই এগারোটা বাজতে না বাজতেই রাজুকে খাইয়ে দেয়। রাজুও এটা মেনে নিয়েছে উৎসাহের সঙ্গেই, কেননা তাতে দুপুরে বেরিয়ে পড়তে সুবিধা হয়।

নৌকায় কিভাবে সামনে থেকে উঠতে হয় শিখিয়ে দিল নারাণ, পাশ থেকে উঠতে গেলে নৌকা উল্টে যেতে পারে। কাকে বলে হাল কাকে বলে দাঁড় আর কাকে বলে লগি এসবও শিখিয়ে দিল।

ছোট নদী। লগি ঠেলে ঠেলেই বেশি যেতে হবে। লম্বা একটা বাঁশের লগি জলে ডুবিয়ে দিয়ে মাটিতে ঠেকে গেলে ঠেলা দিয়ে নৌকা এগিয়ে দিল নারাণ।

কোনো কাজ খুব তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার দক্ষতা রাজুর খুব বেশি। আসলে এটা ছোটবেলা থেকে দাদু তাকে শিখিয়েছে যে মন আর চেষ্টা আর বুদ্ধি দিয়ে একমনে কাজে নামলে খুব তাড়াতাড়ি সেটা আয়ত্তে আনা যায়। আর এই অভ্যেসটা সে করে ফেলেছে। খুব তাড়াতাড়ি সে দাঁড় টানা আর লগি ঠেলার কায়দাগুলো বুঝে ফেলল।

ক্রমশঃ নিবিড় প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে নৌকা। কোথাও গাছপালা ঝুঁকে আছে জলের ওপর, কোথাও বা ঢালু জমি ফাঁকা রেখে গাছেরা সরে গেছে দূরে। পাখির ডাক আর দাঁড়ের ছপছপ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

—এই নদী একটা সরোবরের পাশ দিয়ে গেছে—নারাণ বলল— সে যে কি সুন্দর জায়গা। বিশাল বিল, কত যে পদ্ম ফুল! সে তুই না দেখলে ভাবতেই পারবি না কত সুন্দর!

মুগ্ধ চোখে শোনে রাজু, বলল—কতক্ষণ লাগবে রে?

—লাগবে অনেকক্ষণ। প্রথমে পড়বে সিংহগড়— সে এক বিরাট ভাঙা প্রাসাদ— সামনের বাঁকটা ঘুরলেই দূর থেকেই দেখতে পাবি—

বলতে বলতে বাঁক নিল নৌকা। দূরে দেখা গেল জঙ্গলের মধ্যে মাথা তুলে আছে এক ভাঙা প্রাসাদ—কেমন রহস্যময়। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রাজু।

—বাবা বলে ওটা জমিদারদের—মানে তোদেরই আগে সব—যাকে বলে বাবার বাবা তার বাবা তার বাবা—ওই তাদের বাড়ি ছিল। আমার বাবাও এসব গল্প শুনেছে ঠাকুরদাদার কাছে। এই নদী নাকি তখন অনেক বড় ছিল, বান এসে পাড় ভেঙে দেয়, বাড়িটা ভেঙে চলে যায় নদীতে— একটুখানি রয়ে গেছে। ওই বাড়ির নাম সিংহগড়—সবাই বলে।

—আমি এসব গল্প একটু শুনেছি—অন্যমনস্ক রাজু ওই প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে বলল। কি এক রহস্য তাকে আকর্ষণ করছে। মনে হচ্ছে ছুটে যাই—

নৌকা এখন সিংহগড়ের পাশে।

—একটু দাঁড়া নারাণ, একটু দেখি—রাজু বলল।

নারাণ মাটিতে লগি পুঁতে নৌকা থামাল।

—চল্‌না একটু দেখে আসি—রাজুর মন ছটফট করে উঠল, দাঁড়াতে চাইল।

—আস্তে, আস্তে—নারাণ বলল—ওখানে কিচ্ছু নেই।

—তুই ওখানে গেছিস কখনো?

—গেছিতো! তবে ওই বাড়িটায় ঢুকিনি। ওইতো আশুবুড়ির বাড়ির পিছনে জঙ্গল ওদিক দিয়ে আসা যায়। যা কুলগাছ আছে না! এই এত বড় বড় কুল। আর

জামগাছ আছে—এত বড় বড় জাম হয়! কি মিষ্টি! একটা মজা পুকুর আছে আর ওই ভাঙা বাড়ি— চ, চ, পদ্মবিল যেতে গেলে দেরি করলে হবে না। —নারাণ তাড়া দিল।

—থাক, আজ আর পদ্মবিল যাব না, আজকে চল ওখানেই যাই।

সহসা কেমন একটা করুণ শব্দ বাতাসে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। চমকে উঠল দুজনেই।

—কি যেন একটা শব্দ হল না? —একটু যেন ভীতভাবে নারাণ বলল।

—হ্যাঁ, মানুষের গলা যেন। —রাজু সন্দিগ্ধ গলায় বলল।

—কিন্তু ওখানে তো কেউ থাকে না।

—তাহলে? তুই কি ভয় পাচ্ছিস নাকি? —হাসল রাজু, —ভূতের গলা?

—ভয় একটু লাগছে, আমি তো অনেকবার ওখানে গেছি ভয়টয় লাগেনি। কিন্তু—

আবার আর্তনাদ—এবার একটু জোরে।

—ডাকাত ফাকাত নয় তো? —নারাণ ফিস্ ফিস্ করে বলল—কাউকে ধরে এনে মেরে ফেলছে নাকি রে?

রাজু এবার একটু থতমত খেয়ে গেল, ভূতটুত ওসব কিছু নেই—দাদু বলেছে, কিন্তু ডাকাত যদি হয়?

—চল্, দেখাই যাক— নারাণ এবার বেপরোয়া, —যদি সেরকম কিছু দেখি ছুটে এসে নৌকোয় উঠে পালাব। এখানে তো নৌকোটৌকো কিছু দেখছি না যাতে আমাদের পিছু নেবে—চুপি চুপি বলল নারাণ, লগির ঠেলায় নৌকো অনেকখানি ঠেলে তুলল মাটিতে, লগি পুঁতে নৌকো বাঁধল, দুজনে নামল, নিচু হয়ে আস্তে আস্তে এগোলো।

নদীর দিকে বাড়িটা ভেঙে দুমড়ে নানাভাবে পড়ে আছে জলে কাদায়, তারই ফাঁক দিয়ে দিয়ে সাবধানে এগোলো দুজন।

এবার কাতর আর্তনাদ আবার—দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল তারপর আবার এগোলো। অবশেষে সামনের দিকে পৌঁছাল দুজনে। কেউ কোথাও নেই।

ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দুজন, ভয়ে ও উত্তেজনায় দুজনেই অস্থির, মুখ শুকিয়ে গেছে। আরেকটু এগিয়ে ওরা দেখতে পেল দুটি পা, হাঁটুর ওপর ধুতি— বাকি শরীর আড়ালে।

—কে ওখানে—কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে বলল নারাণ।

এবার করুণ কান্নার শব্দ এবং দেখে মনে হল মানুষটা উঠে বসতে চেষ্টা করছে— দুজনে সাবধানে এগিয়ে গেল।

শুক্রবার দুপুরে রহস্যময় সিংহগড়ের ভগ্ন প্রাসাদে ঢুকেছিল সনাতন। বৃষ্টির পরে সন্ধ্যা নামলে সে মোমবাতি জ্বেলেছিল, কার্বলিক এ্যাসিডের দাগ টেনে টেনে তার শোবার জায়গার চারপাশ সুরক্ষিত করেছিল, তারপর মুড়ি আর জল খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল ক্লান্ত শরীরে টানা ঘুমে রাত কাবার করে দেবে। কিন্তু বৃষ্টির পরে কয়েকটা ব্যাঙ এমন উল্লসিত হয়ে পড়ল যে তাদের গানের চোটে কানের পর্দা বুঝি ফেটে যায়। এপাশ চেপে ওপাশ চেপে অনেকভাবে চেষ্টা করেছিল সনাতন কিন্তু কিছুতেই ম্যানেজ করা যায়নি। আর তখন মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ল তাম্রপত্র— শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ত্রিশূল ডমরু এবং শেষে হাতটি যেন তাকে চড় উঁচিয়ে তাড়া করতে লাগল। এভাবে ঘুমের বারোটা বেজে গিয়েছিল।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা মতো, তরপর আবার যে কে সেই! উঠে পড়ে প্রথমেই নজরে পড়েছিল তাম্রপত্র—সেটা তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সনাতন, সেটা বাইরের চত্বরে গিয়ে পড়ে বারকয়েক লাফিয়ে ঠং ঠং শব্দ তুলে শান্ত হয়ে পড়ল—সেদিকে একবার বিষ নজরে তাকিয়ে শাবলটা তুলে নিয়ে ঘরে, বাইরের চত্বরে, এপাশের ওপাশের বিভিন্নঘরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেখানে যেখানে সমতল মেঝে দেখতে পেল সেখানেই শাবল ঠুকে বুঝতে চেয়েছিল ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায় কি না। এভাবে কয়েকটি জায়গা চিহ্নিত করে খনন শুরু করেছিল।

বেশিরভাগ জায়গাই শ্বেতপাথরে বাঁধানো, যদিও ফেটেফুটে চৌচির তবুও এই ছোট শাবল দিয়ে সেগুলি তুলে তাঁর নিচে জমাট চুনসুরকির আস্তরণ ভেঙে খুঁড়ে গর্ত করা খুবই কষ্টসাধ্য। যত কষ্ট বাড়ছিল তত জেদও বাড়ছিল সনাতনের, এখানে

ওখানে খুঁড়েই চলছিল সে। শনিবার সারাটা দিন সে যেভাবে ছুটোছুটি করছিল যে কেউ দেখলে তাকে পাগল ভাবত। সারাদিন স্নান নেই খাওয়া নেই একভাবে শুধু খুঁড়ে চলা, এভাবে সূর্য ডোবার বেলায় সে হাক্লান্ত হয়ে যখন বসে পড়েছিল তখন তার শরীরে আর সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জর্জরিত সনাতন কোনোক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকে ব্যাগ খুলে মুড়ি গুড় বার করতে চাইলে দেখল সেটা কয়েক হাজার কাঠ পিঁপড়ের দখলে।

এই জঙ্গলের জংলী পিঁপড়েরা এমন মিষ্টি গুড় কখনও খায়নি, সেই অমৃততুল্য খাদ্য মুড়ি সহযোগে— সেগুলি তারা প্রায় শেষ করে এনেছিল। সহসা আক্রান্ত হয়ে তারা শত্রুকে আক্রমণে উদ্যত হলো। সনাতন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গুড়মুড়ির ঠোঙা ছুঁড়ে ফেলে পিঁপড়ের কামড় থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছিল। এভাবে একসময় সে দেখল পিঁপড়ে বাহিনী কেমন সুশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়া মুড়ি গুড় মুখে তুলে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে তাদের আবাসে ঢুকে পড়ল।

বোতলের জলটুকু শেষ করে সনাতন অর্ধমৃতের মতো মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিল।

তারপর সারা রাত কেটে গেছে অর্ধঅচৈতন্য অবস্থায়। সকাল হলো। চারিদিক আলোয় ভরে গেল। পাখির গানে ভরে গেল জঙ্গল মহল। তখন সামান্য চেতনা যেন ফিরে আসছিল। সে ভাবতে চেষ্টা করছিল কিভাবে ফিরবে কিন্তু আবার চিন্তার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। প্রচুর ঘাম বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে, প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেটের মধ্যে কেমন এক যন্ত্রণা। মাথার মধ্যেও যন্ত্রণা যেন হাতুড়ি পিটছিল। এভাবে কতক্ষণ কেটে গেলে সে যেন শুনতে পেল কারা কথা বলছে এবং তখনই সে কাতর আর্তনাদ করে তার উপস্থিতি জানাতে চাইল।

কিন্তু সহসা সব চুপচাপ। তার মনে হলো তাহলে বোধহয় সে ভুল শুনেছে। এখন আশার আলোয় তার জ্ঞান ফিরেছে, সে ভাবছিল এভাবেই এখানে পড়ে পড়ে সে মারা যাবে—ভাবতে গিয়ে সে আবার আর্তনাদ করে উঠল, কিন্তু আর কথাবার্তার শব্দ নেই, তারপর হঠাৎ কে যেন খুব কাছে বলে উঠল—কে ওখানে—

না, এবার আর ভুল নয়—ঠিকই শুনেছে সে মানুষের কণ্ঠস্বর, বাঁচার তীব্র ইচ্ছা

তাকে সচেনত করে তুলল, সে কেঁদে কেঁদে উঠে বসতে চেষ্টা করছিল।

রাজু ও নারাণ এগিয়ে যেতে গেলে সহসা রাজুর পায়ে কি যেন একটা লেগে ছিটকে গেল—ঠং করে শব্দ হলো।

—কি ওটা? বলতে বলতে নারাণ ওটা তুলে নিল—কি এটা? —অবাক হলো সে—এটাই কি—

ততক্ষণে সনাতন হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, দুজনে এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসে পড়ল।

—আরে আরে! এ তো সেই লোকটা, যার ঘাড়ে আমি লাফিয়ে পড়েছিলুম—নারাণ বলল। রাজু কিছুই বুঝতে পারল না, সে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

—ও, তুই জানিস না ব্যাপারটা—বলল নারাণ।

—এ তো সেই মেলায় বড় জিলিপিটা খাচ্ছিল—রাজু বলল।

—ঠিক বলেছিস—নারাণ বলল, সনাতনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল —তাই তো?

সনাতন ঘাড় নেড়ে এ্যাঁও এ্যাঁও শব্দ করল—মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—এটাই আমাদের মন্দির থেকে হারিয়ে যাওয়া মঙ্গলপত্র—রাজু বলল—কিন্তু এটা এখানে এলো কি করে?

—তুমিই এটা চুরি করেছ? —নারাণ জিজ্ঞাসা করল।

আবার সনাতন এ্যাঁও এ্যাঁও শব্দ করে ঘাড় নাড়ল, মানে —হ্যাঁ, হ্যাঁ— তারপর কোনোক্রমে বলল—জল—

—জল? —এদিক ওদিক তাকিয়ে নারাণ ঘরের মধ্যে বোতলটা পড়ে থাকতে দেখল, ওটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল পুকুরের ধারে, ভাঙা ঘাট দিয়ে নেমে বোতলে ভরে আনল—পুকুরের স্বচ্ছ জল।

—পুকুরের জল? এটা খাবে? —রাজু বলল।

—এখন আর অন্য জল কোথা পাব? তবে এ পুকুরটা খুব পরিষ্কার, কে আর নোংরা করছে বল!

ততক্ষণে সনাতন হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছে বোতল, উঁচু করে তুলে ধরে জল

খেতে গেলে তার হাত ভীষণ কাঁপছিল, নারাণ তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলল, বোতলটা মুখে ঠেকিয়ে জলপান করতে সাহায্য করল।

এত হাঁকপাঁক করছিল সনাতন—পারলে মুহূর্তের মধ্যে বুঝি সব জলটা একেবারে গিলে ফেলে। অনেকটা জল পান করে সে কেমন নেতিয়ে পড়ল।

—কি হয়েছে তোমার? —নারাণ জিজ্ঞাসা করল। সনাতন ঘোর ঘোর চোখ তুলে তাকাল, হাত মুখের কাছে নিয়ে খাওয়ার ভঙ্গী করল তারপর পেটে হাত দিয়ে ক্ষুধা বোঝাতে চাইল।

ওরা দুজন কিছুই বুঝতে পারছিল না। কেন লোকটা এখানে। সহসা রাজুর নজর পড়ল এদিক ওদিক সদ্য খোঁড়া গর্ত। একটু দূরে শাবলটাও পড়ে থাকতে দেখল সে। তার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো খেলে গেল কিছু—তবে কি গুপ্তধনের খোঁজে? —বলে ফেলল সে। সনাতন আবার এ্যাঁও, এ্যাঁও শব্দ করে ঘাড় নাড়ল—মানে—হ্যাঁ হ্যাঁ।

দুজনে ওকে ধরে দাঁড় করাতে চাইল, কিন্তু সনাতন দাঁড়াতে পারছিল না।

—চেষ্টা কর, চেষ্টা কর—নারাণ বলল—নদীতে আমাদের নৌকো আছে, এইটুকু হেঁটে চল যা হোক করে।

এবার সনাতন যেন খানিকটা বল পেল। এতটা পথ তাহলে হাঁটতে হবে না। নৌকো আছে। হে ভগবান, তোমার কি দয়া! আর আমি জীবনে কখনও এমন লোভ করব না—মনে মনে বলল সে, জোর করে উঠে দাঁড়াল।

কিভাবে যে ওরা দুজনে মিলে ওকে এনে নৌকায় তুলল! তুলল না বলে—এনে ফেলল—বললেই ভালো হয়! নৌকার পাটাতনের ওপর ফেললে সনাতন হামাগুড়ি দিয়ে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়ল। নারাণ আবার ফিরে ছুটল, সনাতনের ব্যাগে ওর জিনিসপত্র ঢুকিয়ে তাম্রপত্রটা তুলে নিয়ে ফিরে এলো। পরিত্যক্ত সিংহগড়ে বহুকাল পরে বহিরাগত শাবলটা শুধু পড়ে রইল।

নৌকা ছেড়ে দিল নারাণ। তাম্রপত্রটা রাজুর হাতে তুলে দিয়েছে সে। রাজু ওটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল।

—এর মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার আছে জানিস, —রাজু বলল—ওই লোকটাই

বলতে পারবে, ও চারিদিকে গর্ত খুঁড়ে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কোন গুপ্তধনের সন্ধান—

—ওকে ভালো করে খাওয়ালেই ও ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়—নারাণ বলল—কিন্তু গুপ্তধন না কি যেন বললি?

—আমি গল্পে পড়েছি আগেকার দিনে জমিদাররা সোনার টাকা—যাকে বলে মোহর— সেসব লুকিয়ে রাখত মাটির নিচে— তাকে বলে গুপ্তধন, এ বাড়িতেও সেরকম কিছু লুকানো আছে বোধহয়, আর এই তামার পাতটাতে তার নিশানা আছে, তাই এটা চুরি করে ও এখানে এসেছিল।

—তোর দাদু এসব জানে না?

—না তো। দাদু ঠাকুমা, সবাই তো বলে ওটা বাড়ির মঙ্গলের জন্য—

—এ লোকটা তাহলে কে? এ এসব জানল কি করে?

—কি জানি! —রাজু বলল।

—লোকটার থেকে সব জানতে হবে—নারাণ বলল—কিন্তু কাউকে কিছু জানালে হবে না। আমরা এসে গেছি, তুই ওকে আগলে নৌকায় বোস্, আমি কিছু খাবার নিয়ে আসছি।

গরমের দিনে মা দুপুরের রান্না কিছুটা ভাত জল দিয়ে রাখে রাত্রে খাওয়ার জন্য, নারাণ জানে, চুপি চুপি রান্নাঘরে ঢুকে একটা বড় বাটিতে কিছুটা ভাত তুলল নারাণ। একটা সেদ্ধ আলুও পেয়ে গেল ভাতের মধ্যে, নিয়ে এসে উঠল নৌকায়। এ মানুষটার বোধহয় খাওয়ারও শক্তি নেই—নারাণ ভাবলো।

ভাত আর আলুসেদ্ধ দেখেই সনাতনের শরীরে বল—সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে বাটি টেনে নিয়ে গবগব করে গিলতে লাগল। ওর খাওয়া দেখে দুজনেরই ভয় লাগছিল, গলায় ভাত আটকে কিছু না ঘটিয়ে বসে, তাড়াতাড়ি জলের বোতলটা খুলে নিয়ে বসল নারাণ।

১২

বাটির গায়ে লেগে থাকা শেষ ভাতটিও খুঁটে খেল সনাতন, নারাণের হাত থেকে জলের বোতল নিয়ে অনেকটা জল খেল, দুবার ঢেকুর তুলে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

রাজু নারাণ মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল, ব্যাপারটা কি?

—কি হলো? —অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল নারাণ।

—তোমরা আমাকে বাঁচালে—ক্ষীণ কণ্ঠে বলল সনাতন—তোমরা না দেখলে আমি ঠিক ওখানে পড়ে থেকে মরে যেতুম, —আবার ফুঁপিয়ে উঠল সনাতন—তোমরা ভগবান, আমি তোমাদের সব বলব, হ্যাঁ আমিই চুরি করেছি—এত কথা বলে থামল সে।

—কেন চুরি করেছ? —নারাণ বলল। রাজু চুপচাপ শুধু দেখছিল আর শুনছিল, ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতবাক হয়ে গেছে।

—আমি এসেছি অনেকদূর—সেই হরিদ্বার থেকে—আমার নাম সনাতন। সেখানের এক আশ্রমের সাধু মহারাজ আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আশ্রমের পাশেই ধর্মশালা, আমি সেখানে কাজ করি, আশ্রমেরও কাজ করি। সেখানে সকলে আমায় খুব ভালবাসে। সেখানে এক কমবয়সী সাধু আছেন—তিনি খুব ভালমানুষ, আমাকে খুব ভালবাসেন, আমি তাঁকে বলি সন্ন্যিসি দাদা...

...সেই আশ্রমে সনাতনের কেটেছিল বছর পাঁচেক। সে সন্ন্যিসি দাদাকে বলত তার আশ্রমে থাকতে ভালো লাগে না। তার ইচ্ছা করে ঘরসংসার ক'রে গ্রামের কুটিরে থাকতে। কিন্তু তার জন্য অনেক টাকা চাই। সে মাঝে মাঝে লটারির টিকিট কিনে আনত, সন্ন্যিসি দাদাকে বলত ওটায় মন্তর দিয়ে লটারি পাইয়ে দাও। সন্ন্যিসি দাদা বলতেন ওসব হয় না রে পাগল। আরও বলতেন—ঘরসংসার করে সুখী হবি

ভাবিস? অত সহজ নয়, সংসারে হাজার দুঃখ কষ্ট। তবু সনাতন তাঁকে অনুরোধ করত।

একদিন তিনি হেসে হেসে বললেন—লটারি নয়, তোকে একটা গুপ্তধনের সন্ধান দিতে পারি, যদি উদ্ধার করতে পারিস তাহলে অনেক অ-নে-ক টাকা পাবি।

বলেছিলেন—বর্ধমান স্টেশনে নেমে লোকাল ট্রেনে চেপে কুসুমপুর নামে একটা গ্রামে যাওয়া যায়, সেখান থেকে ঘন্টাখানেক হেঁটে পঞ্চসায়র বলে গ্রাম আছে, সেই গ্রামের দক্ষিণে আছে একটা জঙ্গল, সেই জঙ্গলের ভিতর আছে এক ভাঙা প্রাসাদ—সেখানেই লুকনো আছে গুপ্তধন। অবশ্য নাও থাকতে পারে। সে বাড়ির অনেকটাই ভেঙে চলে গেছে নদীতে, সেইসঙ্গে নদীতেই হয়ত তলিয়ে গেছে। কিংবা হয়ত ছিলই না—সবই তাঁর আন্দাজ।

বলেছিলেন—ওই পঞ্চসায়র গ্রামের মধ্যিখানে জমিদার বাড়ি, সে বাড়ির সঙ্গে আছে মন্দির। মন্দিরে বিগ্রহের পায়ের কাছে রাখা আছে একটা তামার ফলক, তাতে নানা চিহ্ন আঁকা আছে, সেটাকে সবাই বলে মঙ্গলপত্র, সংসারের মঙ্গলের জন্য সব মঙ্গলচিহ্ন খোদাই করে ঠাকুরের চরণে রাখা আছে। কিন্তু তিনি নিজে ওই তামার ফলক বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে ওটা আসলে গুপ্তধনের নিশানা। কারণ ওটা আগে ছিল সেই পুরনো প্রাসাদে, সেখান থেকেই এখনকার বাড়িতে আনা হয়।

বলেছিলেন—তিনি অনেক পরীক্ষা করেও যদিও উদ্ধার করতে পারেননি কোনো নিশানা, তবু তাঁর মনে হয়েছে তাঁর ধারণাই ঠিক।

বলেছিলেন—সনাতন একবার চেষ্টা করে দেখতে পারে।

তারপর থেকে সনাতনকে কেমন যেন নেশায় পেয়ে বসে। সময় পেলেই সে সন্ন্যিসি দাদার কাছে বসে শুনতে চাইত সেইসব জায়গার গল্প। সন্ন্যিসি দাদারও ওসব গল্প করতে খুব ভালো লাগে, আর বারবার শুনতে শুনতে সনাতনের সব মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে জমানো টাকা পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সে।

গল্প শেষ করে কেমন ঝিমিয়ে পড়ল সনাতন, বলল—খুব শিক্ষা হয়েছে আমার!

অনেক টাকার লোভ আমি আর করব না। আমি আশ্রমেই ফিরে যাবো, সুখে থাকব। হঠাৎ একবার নারাণের একবার রাজুর হাত ধরে সনাতন, বলল— খোকাবাবুরা তোমরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, এবার একটু দয়া কর, কাউকে কিছু বোলো না, চুপি চুপি ওটা মন্দিরে রেখে দিও, নাহলে জমিদারবাবুরা আমাকে পুলিশে দেবে, খোকাবাবুরা, আমাকে একটু দয়া কর—বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সনাতন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি কেঁদ না, আমরা কাউকে কিছু বলব না, রাজু, তুই ওটা নিয়ে বাড়ি যা। কাউকে কিছু বলিস না। ওটা যেখানে হোক লুকিয়ে রাখিস। তোর খুব বুদ্ধি, পরীক্ষা করে দেখ যদি কোনো নিশানা বার করতে পারিস।

—তোমরা ওসব খুঁজতে যেও না বাবুরা—সনাতন বলল—ও ঠাকুরের জিনিস ঠাকুরের চরণেই রেখে দিও, নইলে আমার মতো বিপদে পড়বে।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। তুমি এখন ঘুমোও, রাত্রে আমি তোমাকে চুপি চুপি খাবার দিয়ে যাবো, সকালে না হয় চলে যেও।

কিন্তু রাত্রে এসে নারাণ দেখল নৌকায় কেউ নেই।



১৩

কদিন ধরে রাজুর কিছুতেই যেন মন নেই। খেতে বসে অন্যমনস্ক, পড়তে বসে অন্যমনস্ক, স্কুলে ক্লাসে মাস্টার মশাই কী পড়াচ্ছেন খেয়াল থাকে না, বোর্ডে কি লিখছেন বুঝতে মনটাকে কোন দূর থেকে যেন ফিরিয়ে আনতে হয়। দুটি জিনিস তার মন জুড়ে আছে—এক ওই তাম্রপত্র—যেটার ছবি তার মনে যেন খোদাই হয়ে গেছে, সারাক্ষণ তার গোপন রহস্য অনুসন্ধান করে বেড়ায়, দুই. ওই সন্ন্যিসি দাদা—যাঁর কথা বারবার বলছিল ওই লোকটি— ওই সন্ন্যাসী কে? যিনি নাকি অনেকদিন ধরে তাম্রপত্রটা পরীক্ষা করেছেন, কে সেই রহস্যময় মানুষ? তাহলে তিনি তো এ বাড়িতেই ছিলেন অনেকদিন। কে তিনি? আগের কোনো পূজারী? —ভেবে ভেবে রাজু অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এল—আগের কোনো পূজারী ছিলেন, যিনি চলে গেছেন হরিদ্বার, সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। এতসব ভেবে রাজু একদিন সকালে বাল্যভোগ দেওয়ার সময় মন্দিরে এসে হাজির, তখন পুরোহিত নিত্যানন্দ পূজার যোগাড় করছেন, রাজু এসে দাঁড়াল, খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সবকিছু।

—কী গো রাজুদাদা, সকাল বেলা মন্দিরে যে? —অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন নিত্যানন্দ—কি দেখছ অত?

—আচ্ছা ঠাকুরদাদু, আপনার আগে এখানে কে পুজো করতেন?

—আমার বাবা। কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

—তিনি এখন কোথায় থাকেন? হরিদ্বার? —ব্যগ্র রাজু প্রশ্ন করল।

—হাঃ! হাঃ! হা! ঠিকই বলেছো দাদুভাই, তবে একটুখানি শুধরে দিতে হবে কথাটা। হরির দ্বারে গিয়ে বসে থাকবেন কেন? বাবা হরির চরণে ঠাঁই পেয়েছেন। সারাজীবন দেবতার সেবা করেছেন, তিনি কি হরিরদ্বারে বসে থাকবেন? চরণেই ঠাঁই পেয়েছেন। রাজু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। বুদ্ধিমান রাজু বুঝতে পারছিল ঠাকুরমশাইয়ের বাবা মারা গেছেন, তাই এমন কথা বলছেন উনি।

—আপনি কতদিন পূজো করছেন? —তাড়াতাড়ি ওই কথা চাপা দিতে চাইল সে।

—তা হয়ে গেল—অর্ধশতাব্দীর ওপর রে ভাই! বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমার বয়স কুড়ি বাইশ বছর, তার আগে থেকেই অবশ্য বাবার সঙ্গে এসে পূজার্চনা করতাম। গত ফাল্গুনে তিয়াত্তর বছর বয়স পেরিয়ে এলাম। —একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিত্যানন্দ, —আর কী! কবে আছি কবে নেই, আমার পর কে যে দায়িত্ব নেবে!

—ঠাকুরদাদু, তামার পাতটা ঠিক কোনখানটায় থাকত?

—এইতো এইখানটায়—হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন নিত্যানন্দ।

—আচ্ছা ওটা নিয়ে কে বেশি নাড়াচাড়া করতেন, দেখতেন?

—কে আর ওটায় হাত দেবে, যেখানকার জিনিস সেখানেই পড়ে থাকত, তবে হ্যাঁ, তোমার বাবা যখন এখানে ছিলেন তিনি রোজ সকালে স্নান করে গরদের ধুতি পরে মন্দিরে আসতেন। খুবই শুদ্ধাচারে ঠাকুরের অঙ্গসজ্জা করতেন। ফুল দিয়ে মালা দিয়ে সাজাতেন। তিনিই কখনো কখনো ওই মঙ্গলপত্রটাও মুছে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন, দেখতেনও বটে। অনেকক্ষণ ধরে উল্টে পাল্টে কি যেন ভাবতেন।

সহসা রাজুর বুকের ভেতরটা এমন ধ্বক ধ্বক করে উঠল!

তাহলে? তাহলে কী—রাজু অস্থির মন নিয়ে ঘরে চলে এল।

স্কুলে কিন্তু নারাণ সেই প্রশ্নই করল, বলল—আচ্ছা রাজু সন্ন্যিসি দাদাটা কে? যে এতকিছু জানে, সব বলেছে ওই লোকটাকে— সে তো এখানকারই কেউ রে? কে বলত?

—উনিই আমার বাবা, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন।

—বলিস কি রে! কি করে বুঝলি?

—সে আমি বুঝেছি।

—তাহলে? দাদুকে বলবি? —কথাটা বলেই নারাণ মত পাল্টাল— না, এখন কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, তুই আগে দেখ ওটার নিশানা কিছু ভেবে

বার করতে পারিস কি না, তাহলে আমরাই গুপ্তধন উদ্ধার করব। তবে ভাবিস না আমি কিছু চাইব! তোদের জিনিস তোরাই নিবি।

— কেন? ভাগ চাইবি না কেন? —হেসে বলল রাজু।

—না রে, পরের জিনিসে লোভ করতে নেই। —বলল নারাণ—কিছু কি ভেবে বার করতে পারলি?

—নাঃ! —হতাশ ভাবে বলল রাজু।

টিফিন শেষের ঘন্টা বাজল।

টিফিনের পর ড্রইং ক্লাস। আঁকার স্যার বোর্ডে একটা দৃশ্য এঁকেছেন—এঁকে বেঁকে বহে গেছে নদী, নদীর ওপারে সূর্য উঠছে, এপারের চরে কিছু কাশফুল। খাতায় আঁকতে হবে ছবিটা, রঙ দিতে হবে। সূর্য উঠছে, আধখানা সূর্য এঁকেছেন স্যার, সূর্যরশ্মি বোঝাতে আধখানা গোলের পাশে লম্বা লম্বা রেখা টেনেছেন। আঁকতে গিয়ে সহসা থেমে গেল রাজু, হাত কেঁপে গেল—তামার ফলকটার মাথার দিকে অমনই একটা ছোট্ট সূর্য আঁকা আছে না? তার মানে কি? ওটা কি তাহলে পূর্বদিক বোঝাচ্ছে? উত্তেজনায় বুক দুরুদুরু করে উঠল রাজুর।

বিকালে বাড়ি এসেই সে চুপি চুপি একতলার সেই ঘরে ঢুকল যেখানে সে ওটা লুকিয়ে রেখেছে। এ ঘরটি পরিত্যক্ত জিনিসপত্রে ঠাসা। এখানেই একটা ভাঙা টেবিলের ড্রয়ারে ওটা রেখেছে সে, ঘরের ভেতর ও বাহির ভালো করে দেখে নিয়ে সে ড্রয়ার খুলল। ড্রয়ারে শান্ত হয়ে শুয়ে আছে রহস্যময় তাম্রপত্র। হ্যাঁ, ওইত ওটার মাথার দিকে ছোট করে আঁকা ওটা কি উদীয়মান সূর্য নয়? তাহলে ওটা কি পূর্বদিক বোঝাচ্ছে? তাহলে এটা কি একটা মানচিত্র? সূর্যের নিচে এই বড় বৃত্তটা কি? একটা বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিল রাজুর মাথায়—বৃত্তটা তাহলে সেই বড় দীঘি! আর তার নিচে ঘরকাটা এগুলি বাড়িটার ঘর নয় তো কি?

কিসের যেন একটা শব্দ হলো? —মনে হলো রাজুর, দ্রুত হাতে ড্রয়ার বন্ধ করল সে, ঘরের বাইরে এল। ছুটে পালাল একটা ইঁদুর! দরজাটা বন্ধ করে চুপি চুপি ওপরে উঠে এল।

হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে ছাদে গেল রাজু। পূর্বদিকের পাঁচিলের গায়ে

বুক চেপে দূরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে চাইল সেই ভাঙা প্রাসাদের দৃশ্য। ক্রমশঃ আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে উঠল তার মন—ঠিকই ভাবতে পেরেছে সে। দুই সারিতে আটটা ঘরের ছবি আঁকা আছে মানচিত্রে, অস্থির রাজু নিচে নেমে এল, ঢুকল একতলার সেই ঘরে, দরজা ভেজিয়ে এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে, ড্রয়ার খুলল।

—এই উদীয়মান সূর্য—তর্জনী রাখল সূর্যের ওপর—এটা পূর্ব দিক, —ভাবল রাজু—তার মানে পূর্ব দিকে মুখ করে প্রাসাদের সিঁড়িতে দাঁড়ালে সামনে পড়বে দীঘি—দীঘির ওপর আঙুল রাখল রাজু—তাহলে এগুলি দুইসারি ঘর! শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, —প্রথম মানে সামনের সারি, তারপর দ্বিতীয় সারি—ত্রিশূল, ডমরু, অর্ধচন্দ্র, হাত! কিন্তু এইসব চিহ্নগুলি দেবতাদের—ভাবল রাজু—শুধু এই হাত চিহ্ন এটা আর সব চিহ্ন থেকে আলাদা—হাত চিহ্নের ওপর তর্জনী রেখে ভাবল রাজু। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম দেবতা নারায়ণের হাতে থাকে, আর ত্রিশূল ডমরু অর্ধচন্দ্র এসব দেবতা শিবের—ঠাকুমার কাছে জেনেছে সে, কিন্তু হাত?

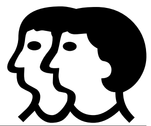
হাতের ওপর আঙুল ঠুকতে ঠুকতে সহসা রাজুর মনে হলো উল্টোপিঠে কি আছে যেন? একটা ঘট— সেটা কোথায়? সেটা তো একধারে—সেটা কি এই হাতের নিচে? সাবধানে উল্টে দেখল ঠিক তাই! তার মানে এখানে হাত রাখলে নিচে পাবে ঘট।

ফলক উল্টে ঘটটির ছবি ভালো করে দেখতে লাগল রাজু। ঘটের ওপর আমপাতা, ডাব কিন্তু ঘটের গায়ে এটা কি আঁকা? পুজোর ঘটে তো উর্দ্ধদুই বাহু কেমন একটা চিহ্ন আঁকা হয়, এখানে কিন্তু একটা ছোট গোলাকার দাগ। তার মধ্যে মানুষের মুখ। উত্তেজনায় বুক ধ্বক ধ্বক করে উঠল রাজুর—এ তো টাকার ছবি!

মানে—তাম্রপত্র পূর্বদিকে মুখ করে রাখো, হাতচিহ্নের নিচে আছে টাকার ঘট— হাতচিহ্নের ঘর এই ডানদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের নিচের সারির শেষ ঘর!

দিন শেষ, অন্ধকার হয়ে আসছে। তাম্রপত্রের ছবিগুলি আবছা দেখাচ্ছে। কাঁপা কাঁপা হাতে ড্রয়ার বন্ধ করল রাজু। ঘামে ভিজে গেছে সারা গা। কাঁপা কাঁপা হাতে দরজা বন্ধ করে এগিয়ে চলল রাজু। তার পা টলছিল।

১৪



নদীর ধার বরাবর একটা পায়ে চলা পথ আছে সেটা বুনো নারাণের পথ, সেটার সন্ধান সনাতনের জানার কথা নয়, তাই সে অনেক ঘুরপাক খেয়ে নিশানায় পৌঁছেছিল। কিন্তু নারাণ তার পরিচিত পথে কাঠবিড়ালীর মতো দৌড়াচ্ছিল। কখনও সোজা, কখনও এঁকে বেঁকে, কখনও নিচু হয়ে ঝোপ জঙ্গল বা গাছেদের নুয়ে পড়া ডালের ফাঁক দিয়ে। রাজু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারছিল না। আজ রবিবার, অভিযানে বেরিয়েছে দুজনে।

—আস্তে নারাণ, একটু আস্তে—রাজু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল। কিন্তু নারাণের যেন তর সইছিল না। ফলকের চিহ্নের মধ্যে রাজু কি অবিষ্কার করেছে নারাণ শুনতে চায়নি। অতশত বোঝবার তার দরকার নেই। সে শুধু ভাবছে ওখানে পৌঁছলেই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে!

ডানদিকে গাছের ফাঁক দিয়ে কখনও দেখা যাচ্ছে নদী, কখনও পথ চলে আসছে একেবারে নদীর গায়ে। এই সোজা পথে দৌড়তে দৌড়তে খুব তাড়াতাড়িই ওরা প্রাসাদে পৌঁছে গেল।

—এবার দেখা তোর কারসাজি—নারাণ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল। রাজু সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল চত্বরে, নারাণ তাকে অনুসরণ করল। পেটের কাছে গোঁজা তাম্রপত্র বার করল রাজু, রাখল চত্বরের মেঝেতে, হাঁটু মুড়ে বসল। দেখাদেখি নারাণও ঝুঁকে বসল পাশে।

—এই দ্যাখ—এই যে আধখানা সূর্য্য আঁকা—মানে পূর্বদিক— সামনের দিকে হাত তুলে বলল রাজু —ওটা তো পূর্বদিক?

সূর্য্য এখন মাথার ওপর নেই, একটু পিছনে হেলেছে।

—বোঝাই যাচ্ছে সামনে পূর্ব দিক— নারাণ বলল।

—এরপর এই বড় গোল আঁকা, খুব ভালো করে দ্যাখ গোলের মধ্যে ছোট ছোট দাগ— যেমন আমরা পুকুর এঁকে জল বোঝানোর জন্য দাগ দিই— তেমন। আসলে অনেকদিন ধরে এটা মুছে মুছে দাগগুলো খুবই হালকা হয়ে গেছে।

—তার মানে ওটা পুকুর? ওই সামনের পুকুরটা? —নারাণ অবাক হয়ে বলল— ওঃ! তোর কি বুদ্ধিরে!

—তাহলে এই ঘরগুলো আঁকা এগুলো আমাদের পিছনের এই ভাঙা ঘরগুলোই বোঝাচ্ছে, তাই না? —রাজু বলল।

—তা তো হবেই, তুই যখন মাথা খাটিয়ে এত বার করেছিস!

—তাহলে দেখা যাক এই হাত চিহ্নর ঘর কোনটা।

—কেন?

—এই দ্যাখ, এই হাত চিহ্নের নিচেই আছে টাকার কলসী—নারাণকে উল্টে পাল্টে ভালো করে বোঝাল রাজু—এই দেখ কলসীর গায়ে টাকা আঁকা আছে।

এদিকের শেষের ঘরটা এমনভাবে ভেঙেছে বোঝাই মুশকিল যে এটি ঘর ছিল। ছাদ সমেত ভেঙে উল্টে গেছে নদীর দিকে। ওদিকে ছাদের ওপর কতকাল ধরে বিশাল হয়ে উঠেছে এক বটগাছ, ডালপালা বিস্তার করে ঝুঁকে পড়েছে, নামিয়েছে ঝুরি। কয়েকটা ঝুরি মেঝে ভেদ করে নেমে গেছে মাটিতে।

মাথা নিচু করে দুজনে এগোল, এতই নিচু ডালপালা সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলে ডালপালার ফাঁক ফোকর খুঁজতে হয়। সেভাবেই দাঁড়াল দুজন।

—এই মেঝের নিচেই বোধহয়—কথাটা গলায় আটকে গেল রাজুর।

—হি হি হি! কোথায় আছিসরে, টাকার কলসী? —হাসতে হাসতে এখানে ওখানে লাফাতে লাগল নারাণ— কোন গর্তে আছিস বাবা, বেরিয়ে পড়— বলতে বলতে ধপাস ধপাস করে জোড়া পায়ে লাফাতে লাগল নারাণ। আর ঠিক তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটল, হঠাৎ এক জায়গায় মেঝে ভেঙে নেমে গেল, আর হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে হারিয়ে গেল নারাণ। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল—বুঝতে একটু সময় লাগল রাজুর, তার হাত পা কাঁপতে শুরু করল। নারাণ, না-রা-ণ, চিৎকার করে ডাকল সে, বসে পড়ল, ঝুঁকে দেখতে চাইল, আবার চিৎকার করে ডাকল, কিন্তু

কোনো সাড়া পেল না। ক্ষীণ একটা আওয়াজ শোনা গেল কি? আরেকটু এগিয়ে ঝুঁকে দেখবে মনে করেও পিছিয়ে এল রাজু। বিপদের সময় বুদ্ধি হারাতে নেই— বিড় বিড় করে দুবার বলল সে, ভাবল—আমিও ভেঙে পড়ে যেতে পারি। হাতে ধরা তাম্রফলকটা পেটের কাছে গুঁজে নিল। তারপর পিছন ফিরে দৌড়।

নারাণ যখন পড়ে যাচ্ছিল তখন গায়ে মাথায় এসে পড়ছিল ইট, পাটকেল, রাবিশ, এভাবে সে এসে পড়ল শক্ত মেঝেতে। মাথায় তো আঘাত লেগেছিলই তাছাড়া হঠাৎ ঘটা দুর্ঘটনায় হতভম্ব হয়ে গেল সে। এভাবে সামান্য সময় চেতনা হারাল। তারমধ্যে শুনতে পেল রাজুর ডাক, সাড়া দিতে চেষ্টা করল সে, একটা ক্ষীণ আওয়াজ বের হলো গলা দিয়ে।

যখন চেতনা ফিরল আর ধাতস্থ হল তখন সে চিৎকার করে কয়েকবার রাজুকে ডাকল, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল গর্তের মুখ দিয়ে হালকা আলো আর গাছের সবুজ পাতার আভাস। চারপাশে তাকিয়ে দেখল। বেশ ভয় করছিল, কি আছে ঘরের মধ্যে কে জানে! কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ— দমবন্ধ করা।

একটু সময় চোখ সয়ে এলে সে দেখল ছোট একটা ঘর, চারিদিকে দেওয়াল, এক কোণে কালো মতো ওটা কি? বুকটা ধড়াস করে উঠল, পেছিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকল—কি ঠাণ্ডা দেওয়াল! গা শিরশির করে উঠল। যদি ওটা অজগর হয়? ভাবতেই হাত পা ঠাণ্ডা, জড়িয়ে পেঁচিয়ে গিলবে শেষে। কিন্তু এই বন্ধ ঘরে জ্যান্ত প্রাণী আসবে কি করে? থাকতেও পারে কোনো ফাঁক ফোকর। অনেকক্ষণ কেটে গেল অপলক তাকিয়ে, কিন্তু ওটা নড়ছে না। হঠাৎ মনে পড়ল নারাণের এ ঘরে তো টাকার কলসী থাকার কথা, ভয়ের চোটে ভুলেই গিয়েছিল। বুকে বল এল তার।

সাহস করে একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল নারাণ, ঠক করে একটা শব্দ—কিন্তু নড়ন চড়ন নেই। আবার ইট ছুড়ল—আবারও শব্দ। এগিয়ে গিয়ে পা দিয়ে ঠেলা দিল, গড়িয়ে গেল দুটো ছোট ছোট কলসী। হাত দিয়ে দেখল মুখ বন্ধ।

চিৎকার করে উঠল নারাণ—রাজু, পেয়েছি, পেয়েছি গুপ্তধন।

কেউ সাড়া দিল না।

গর্তের মুখ থেকে ঝুর ঝুর করে খসে পড়ল আরও কিছুটা চুনসুরকির রাবিশ।

আবার চিৎকার—রাজু, রাজু, রা-জু—

কোনো সাড়া নেই।

কী বিশ্রী একটা গন্ধ বাতাসে। কতকালের বদ্ধ বাতাস কে জানে! নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট লাগছে। গর্তমুখের ঠিক নিচে এসে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিল উর্দ্ধমুখে।

ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ— রাজু আমাকে ফেলে পালাল?

কতক্ষণ কেটে গেল, পা দুটো টনটন করছে, গর্তের ঠিক নিচে বসল নারাণ, ওপর দিকে চেয়ে রইল। ওটুকুই বুঝি আশার আলো! তার চোখ বুজে আসছিল। কিন্তু বুঝতে পারছিল না, মনে হচ্ছিল চোখ বুজলেই সে হারিয়ে যাবে।

নদীকে বাঁয়ে রেখে ছুটছিল রাজু। নদীকে লক্ষ্য রাখল যাতে না পথ হারিয়ে যায়। দ্রুত ছুটতে গিয়ে দুবার হোঁচট খেয়ে পড়ল, আবার উঠে দৌড়। সহসা সামনে নুয়ে পড়া একটা গাছের ডাল। যাবার সময় এগুলি মাথা নুইয়ে যাওয়া হয়েছিল এখন একটুর জন্য মাথা বাঁচাতে পারল রাজু কিন্তু নত হয়ে মাথা বাঁচাতে গিয়ে আবার পড়ল, ছড়ে গেল হাঁটু, বসে পড়ল।

কিন্তু থামলে চলবে না। হাঁটুর যন্ত্রণায় বসে পড়লে চলবে না। বরং সাবধানে ছুটতে হবে। আমি যদি এখানে পড়ে থাকি নারাণ শেষ হয়ে যাবে। —হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান—বলতে বলতে ছুটতে লাগল সে—নারাণকে বাঁচিয়ে রেখ, হে ভগবান!

অবশেষে পৌঁছাল নারাণদের বাড়ি। বাইরের দাওয়ায় নারাণের বাবা মাছধরা জালের ছেঁড়া ফুটো মেরামত করছিল, রাজু গিয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—নারাণ গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে, শিগগির চলুন।

বুঝতে গগনের সময় লাগল, বলল—কোথায় গর্ত?

—সেই সিংহগড়ের ভাঙা বাড়িতে, মেঝে ভেঙে ভেতরে কোথায় পড়ে গেছে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হল গগনের, বিপদটা বুঝে লাফিয়ে উঠল। ছুটে বেরিয়ে একে ওকে ডাকতে লাগল।

নারাণের মা শুনেছে, কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে, বোনটাও কাঁদছে। ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল কয়েকজন।

—জালের মোটা দড়ি একগাছা নাও শক্ত দেখে—বলল একজন।

—টর্চ আছে কারো? একটা নিলে হতো।

—আমার আছে।

—আনো তাড়াতাড়ি—

রাজু ছুটল, পিছনে সবাই।

সমবেত কোলাহল আর নানান গলায় নারাণ নারাণ ডাক হালকা ভেসে আসছে—তন্দ্রা ছুটে গেল নারাণের, চিৎকার করে উঠল—আমি এখানে—

—ঠিক আছিস? বাবার গলা শুনল নারাণ।

—হ্যাঁ—এ্যাঁ—লম্বা করে হ্যাঁ বলল সে।

—গর্তের কাছে হুড়োহুড়ি করে সবাই যাবেন না—চিৎকার করে সাবধান করল রাজু—আরও ভেঙে যাবে, সবাই পড়বেন।

—তাহলে দড়ি নামানো হবে কী করে? তোলা হবেই বা কি করে?

সকলে চিন্তায় পড়ে গেল। ভেবেছিল গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে কুয়োর মতো দড়ি নামাবে। ভেবেচিন্তে একটা উপায় বেরল—বটগাছের একটা মোটা ডালের ওপর দিয়ে দড়িটা ঝুলিয়ে নামাতে হবে, দূর থেকে টানতে হবে। তাই করা হলো।

ভালো করে হাতে পাকিয়ে ধর্—গগন বলল।

দড়িটা নেমে আসছে, নারাণের নাগালে, আহ্! —দড়িটা ধরে ফেলল সে। উঠছে, শূণ্যে দুলছে, হাত দুটো ছিঁড়ে যাবে বুঝি— আহ্! অবশেষে মুক্ত বাতাসে!

—কি আছে ওখানে? —উঠতে না উঠতেই জিজ্ঞাসা সকলের।

—কি-কিচ্ছু না, মেঝেটা ভেঙে ধ্বসে গর্ত হয়ে গেছে।

—তা এখানে কী করতে এসেছিলি? —নারাণের হাত মুচড়ে ধরে বলল গগন—সঙ্গে আবার ওই ভালো ছেলেটা? নিজে গোল্লায় গেছ বেশ করেছ, ভালো ছেলেটার মাথা খাচ্ছ কেন?

নারাণ চিল চিৎকার জুড়ে দিল। গুম্ গুম্ করে পিঠে দুটো কিল দিয়ে গগন ওকে ছেড়ে দিল।

—রাজুর দাদুকে যেন এসব কিছু বলো না—তাহলে এই ছেলের জন্য আমাকে গ্রাম ছাড়তে হবে। উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করল গগন।

—না, না, এটা কী বলার মতো কথা—সবাই বলল।

—যদি দুজনেই পড়ত? কি হতো বলতো?

সকলে শিউরে উঠল, তাইতো! এটাতো কেউ ভাবেনি এতক্ষণ! এই নির্জন জঙ্গলে গর্তের মধ্যে—ভাবা যায় না, উঃ!

সকলে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছে, নারাণ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটু পিছিয়ে পড়ছিল। রাজু তার পাশে পাশে।

—ওখানে দুটো মুখবন্ধকরা কলসি আছে—ফিসফিস করে বলল নারাণ।

—তবে যে বললি—

—চুপ চুপ, যা বলছি শুনে যা। ওখানে সকলের সামনে বললে হয়েছিল আর কি! শোন, কালকে যেভাবে হোক স্কুল কামাই করবি। আমিও স্কুল যাবো না। কালকেই দুপুরে ওটা তুলতেই হবে। দেরী করলে হবে না।

—কিন্তু স্কুল না গেলে দাদু—আচ্ছা ঠিক আছে, সকাল থেকে কবার মিছিমিছি ইয়ে গেলেই হবে— হাসতে হাসতে পেট চাপড়ে দেখাল রাজু।

—আমি ঠিক সময় তোকে ডেকে নেবো—ফিস ফিস করে বলল নারাণ।

১৫

আজ আবার নৌকা অভিযান। নিঝুম দুপুর। দুহাতে দ্রুত বৈঠা টানছিল নারাণ। রাজু হাল ধরেছিল। দুজনে চুপ।

নৌকায় লম্বালম্বি শোয়ানো একটা বাঁশ। বাঁশটার কঞ্চিগুলি পুরো কাটা হয়নি। অর্থাৎ খানিকটা করে রেখে কাটা হয়েছে। এটা খুব সকালে উঠে জোগাড় করেছে নারাণ, এনে রেখেছে নৌকায়। বাবা ভোরবেলা মাছ ধরতে বেরিয়ে গেলেই সে উঠে পড়েছিল, বাড়ির পিছনে এই বাঁশটা দাঁড় করানো ছিল। একটা কুমড়ো গাছকে ঘরের চালে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য এটা ছিল ঠেকা। এটা দিয়ে যে কি হবে রাজুর মাথায় আসছিল না।

সিংহগড়ের পিছনে সেদিনের মতো নৌকো বেঁধে নারাণ বাঁশটার একদিক ধরল, আরেকটা দিক রাজুকে ধরতে বলল। এভাবে ওরা দুজনে নিয়ে গেল ওপরে।

—এটাকে গর্তের মুখে নিয়ে যেতে হবে—বলল নারাণ।

এবার ব্যাপারটা রাজুর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

বটগাছের ডালপালার বাধা কাটিয়ে বাঁশটা গর্তে নামিয়ে দিলে নিচের মেঝেতে দাঁড়িয়ে গেল সেটা, তারপরেও অনেকটা বেরিয়ে রইল গর্তের ওপর। গাঁটে গাঁটে পা দিয়ে সাবধানে নেমে গেল নারাণ।

একটা একটা করে দুবারে দুটো কলসি তুলে আনল নারাণ। ছোট হলেও কলসি দুটি বেশ ভারি। কাজটা করতে বেশি সময় লাগল না। দুজনে দুটো কলসি হাতে নিয়ে নৌকায় উঠল। পাটাতনের নিচে কলসি দুটি লুকিয়ে ফেলল নারাণ।

সমস্ত কাজটা করতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। নৌকা ছেড়ে দিয়ে দুজনে খুব হাসল।

—তোর বুদ্ধিও কম নয়—বলল রাজু।

—তোর কাছে কিচ্ছু নয়! —বলল নারাণ।

এখন তুই বাড়ি চলে যাবি। অন্ধকার হলে আমি এ দুটো তোদের বাগানে নিয়ে যাব। কানটা খোলা রাখিস, ডাকব।

১৬

রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় ইন্দ্রনাথ রাজুকে পড়াতে বসেন। কদিন ধরে তাঁর মনে হচ্ছে রাজুর পড়াশোনায় মন বসছে না। সারাক্ষণ কেমন অন্যমনস্ক ভাব অথবা অস্থিরতা। এটা তিনি লক্ষ্য করেছেন ছুটির দিন দুপুরে সে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়। জেনেও তিনি না জানার ভান করেন রাজু তা বোঝে না। আসলে তিনি জানেন শুধু বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে জীবনে সব কিছু শেখা যায় না। এই মুক্ত প্রকৃতির মাঝে কত কিছু শেখার আছে, জানার আছে, অনুভব করার আছে, আর এসব পেতে গেলে চাই সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গ। ডানপিটে নারাণকে তিনি সেই রথের মেলায় যাবার দিনই বুঝে নিয়েছেন। ওরকম একজন বন্ধুর দরকার আছে রাজুর। কিন্তু তাই বলে পড়াশোনায় অবহেলা করলে তো চলবে না।

আজ সন্ধ্যায় পড়তে বসতে রাজুর দেরি হলো। সাধারণত রাজু পড়তে বসার কিছুক্ষণ পর তিনি এসে বসেন, আজ কিন্তু দেরি হচ্ছে দেখে নিজেই এসে বসলেন। কিছুক্ষণ পর রাজু তাড়াতাড়ি বইয়ের ব্যাগ নিয়ে এসে বসে পড়ল।

—দেরী কেন? —ইন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

—নিচে ছিলাম—থতমত খেয়ে রাজু বলল।

—এতক্ষণ নিচে?

—ওই, বাগানে—ঢোক গিলল রাজু—কিছু বলতে পারল না।

—একটু আগে নারাণের পাখির ডাক শুনলাম—আরও গম্ভীর গলায় বললেন ইন্দ্রনাথ, —সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, এখনও ও বাইরে, তুমিও ওর সঙ্গে এতক্ষণ খেলে বেড়াচ্ছ।

রাজুর মাথা ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করেছে। দাদু ওই পাখির ডাকফাক সবই জেনে ফেলেছে। মুখ নত করল রাজু।

—এভাবে চললে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমি ভেবেছিলাম প্রথম বছরেই

তুমি স্কুলে দারুণ কিছু রেজাল্ট করে নিজেকে তুলে ধরবে। অনেক বড় মুখ করে আমি তোমাকে হেডমাস্টার মশায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম।

রাজুর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছিল। এরকমভাবে দাদু কখনও তাকে বকেননি।

—আজ শরীর খারাপের মিথ্যা অজুহাতে তুমি স্কুলে যাওনি, অথচ দুপুরে বেরিয়েছিলে, তুমি ভাবো আমি কিছুই জানি না। ছিঃ, ছিঃ, এত অবনতি তোমার।

রাজু এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

—কেঁদো না, কেঁদো না, —দাদু নরম গলায় বললেন—খেলাধূলাও করবে, ঘুরেও বেড়াবে, কিন্তু লেখাপড়ায় অবহেলা করে নয়, —বলতে বলতে দাদু বইয়ের ব্যাগ টেনে নিলেন, ব্যাগ খুলে বই বার করতে গেলেন, আর তখনই আরেক ধাক্কা—তাম্রপত্র বেরিয়ে এলো দাদুর হাতে।

—একী? এটা এখানে? —তিনি নিজের চোখকে বুঝি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

আজ রাজুর ঘোর দুর্দিন, একটার পর একটা বিপর্যয়। গতকাল বিকালে এসে তাড়াতাড়িতে আর নিচের ঘরে গিয়ে লুকানো হয়নি, ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিল, সকালে ধীরেসুস্থে নিচের ড্রয়ারে রেখে আসবে, কিন্তু সকাল থেকে অসুখের ভান করতে করতে আর সময় হয়নি। আর এখন ওটা দাদুর হাতে।

—তুমি এটা নিয়েছ? মন্দির থেকে তুমি এটা চুরি করেছ? —ইন্দ্রনাথ কী বলবেন কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না, এটা কী করে সম্ভব? রাজুর এত অবনতি? ওঃ! রাগে দুঃখে তিনি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন রাজুর দিকে।

—না, আমি ওটা চুরি করিনি—রাজু দৃঢ় ভাবে বলল—একজন ওটা চুরি করেছিল, আমি আর নারাণ তার কাছ থেকে ওটা উদ্ধার করেছি।

—তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না, মনে হচ্ছে একটা মিথ্যে চাপা দিতে তুমি আরেকটা মিথ্যে গল্প তৈরি করছ।

—না, আমি মিথ্যা বলছি না, একজন ওটা চুরি করেছিল।

—কে সে?

—সে এখানকার লোক নয়, সে এসেছিল হরিদ্বার থেকে, তার নাম সনাতন।

রাজু যেন এক একটা গোলা ছুঁড়ছে আর ইন্দ্রনাথ সামাল দিতে পারছে না।

একজন চুরি করেছিল!

সে এসেছিল হরিদ্বার থেকে!

রাজু আর নারাণ তার কাছ থেকে উদ্ধার করেছে!

—কি সব বলছ তুমি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—অবাক ইন্দ্রনাথ বললেন।

—মনে হয় হরিদ্বার থেকে ওকে পাঠিয়েছেন বাবা! —আস্তে বলল রাজু।

আরেকটা গোলা, কিন্তু এটা কী ভীষণ! কি বলছে রাজু ও কী জানে?

—কি বললে? কি বললে তুমি? পাঠিয়েছেন বাবা, মানে? কার বাবার কথা বলছ তুমি?

—মনে হয় আমার বাবা, তিনি ছাড়া ওটার কথা আর কে অত জানে। তাঁর কাছেই ওই লোকটি শুনে শুনে এখানে এসেছিল গুপ্তধনের সন্ধানে।

আবার একটা গোলা—গুপ্তধন! ছেলেটা কি পাগল হয়ে গেল?

ইন্দ্রনাথ কথা বলতে ভুলে গেলেন।

—ওই তামার পাতে গুপ্তধনের নিশানা ছিল। আমি আর নারাণ সেটা পেয়েছি।

—এ নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছে—হতাশ হয়ে ইন্দ্রনাথ বললেন—গল্পের বই পড়ে কিছু একটা মাথায় ঢুকেছে তোমার। কিন্তু— কিন্তু— তোমার বাবার কথা কী বলছ রাজু? —ইন্দ্রনাথ রাজুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, দুহাত দিয়ে ধরলেন রাজুর বাহু, বললেন—তুমি জান তুমি কী বলছ? তুমি তোমার বাবার কথা বলছ রাজু? নরেনের কথা বলছ? —ডেস্কের ওপর রাখা ফটোর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন ইন্দ্রনাথ, আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

—হ্যাঁ দাদু, তোমাকে আমি সব বলব—শান্ত গলায় বলল রাজু।

তাম্রপত্রটি নিয়ে বলল—এটা চুপিচুপি ঠাকুরের বেদীতে রেখে আসব? এখন তো মন্দির খোলা আছে।

—যাও, —বললেন ইন্দ্রনাথ, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, দুটো হাত এলিয়ে

দিলেন। তাঁর বুক ধড়ফড় করছিল, শরীরের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেছে। কিছু ভাববার শক্তিও যেন নেই। চোখ বুজে নির্জীব ভাবে বসে রইলেন তিনি।

ফিরে এসে রাজু বসল তার পাশে, বলে গেল সমস্ত ঘটনা। ইন্দ্রনাথ যেন কোন দূর দেবলোকের আকাশবাণী শুনছিলেন!



১৭

ভোরবেলা ঠাকুরমশায় নিত্যানন্দ হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছেন—মঙ্গলপত্র ফিরে এসেছে। ওরে বিশু, চোখ খুলে দেখ। ও বড়মা, এসো, দ্যাখো। কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! যে জিনিস হারিয়ে গেল সে আবার নিজেই ফিরে এল! কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!

গগনেরা এসময় মাছ ধরতে বের হয়, হৈ চৈ শুনে সবাই এসে গেল দেখতে। সূর্য ওঠার সাথে সাথে গ্রামের সবাই জেনে গেল মন্দিরের হারিয়ে যাওয়া মঙ্গলপত্র আবার আপনিই ফিরে এসেছে!

এ সবই ঠাকুরের লীলা—সবাই বলল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওটা হারিয়ে যাওয়ায় সকলের মনেই কেমন একটা অস্বস্তি। একটা প্রিয় জিনিস হারানোর বেদনা জড়িয়ে ছিল, এখন সেটা কেটে গেল।

ঠিক তখন জমিদারবাড়ির নিচের পরিত্যক্ত ঘরে হাজারটা পরিত্যক্ত জিনিসের মধ্যে বহুকালের পরিত্যক্ত দুটি কলসির মুখ—যা তামার পাত দিয়ে মুড়ে বন্ধ করা ছিল—খুলে ফেলেছে নারাণ, ইন্দ্রনাথের পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে বহুকালের পরিত্যক্ত অজস্র বাদশাহী মোহর। রাজু আর নারাণ বসে, ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে, যেন তিনটি পাথরের মূর্তি!

—এসব তোমাদের, তোমরা এগুলি উদ্ধার করেছ—ইন্দ্রনাথ বললেন।

—না না, এসব আপনার, আপনাদেরই কেউ এসব জমিয়ে রেখে গেছেন। বলল নারাণ।

—না, না এ আমি নিতে পারি না, —বললেন ইন্দ্রনাথ।

—তাহলে আমরা এসব নিয়ে কি করব? —অবাক হয়ে বলল নারাণ।

—তা ঠিক, তা ঠিক, তোমরাই বা কী করবে! আসলে আমার মাথা ঠিক কাজ করছে না। তোমরা জানো না, বুঝতে পারছ না, কি বিশাল মূল্যের সম্পদ তোমরা উদ্ধার করেছ।

—এর বুঝি অনেক টাকা দাম দাদু? —রাজু বলল।

—অনেক, অনেক! এক একটি মোহরের দামই হয়তো হাজার দশেক টাকা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কম বয়সে এসব আমার হাতে আসেনি, তাহলে হয়ত—

—আচ্ছা, এ দিয়ে একটা বড় স্কুল তৈরি করা যায়? —নারাণ জিজ্ঞাসা করল।

—খুব ভালো কথা বলেছ—ইন্দ্রনাথ বললেন—কিন্তু একথা তোমার মনে হলো কেন?

—আমাদের গ্রামে বড় স্কুল নেই, কুসুমপুরে সবাই পড়তে যেতে পারে না, মেয়েরা তো পড়তেই পায় না। তাছাড়া ওই গ্রামের ছেলেরা আমাদের খুব তাচ্ছিল্য করে।

—সত্যি, এসব আমাদেরই বংশের অবহেলা, —ইন্দ্রনাথ সখেদে বললেন—অপদার্থ জমিদার আমি, কিছুই করতে পারিনি গ্রামের জন্য। কুসুমপুরের ওরা পেরেছেন। আসলে আমাদের অবস্থাও খুব পড়ে গিয়েছিল, আর এখন তো কিছুই নেই। সত্যি নারাণ, সবচেয়ে বড় চাওয়াটা তুমি এতটুকু ছেলে হয়ে চেয়ে ফেলেছ। শিক্ষাই মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এ টাকায় আমরা একটা বড় স্কুল গড়ব, সেখানে সকালে মেয়েরা আর দুপুরে ছেলেরা পড়বে। শুধু আমাদের গ্রাম নয়, আশপাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরাও পড়বে।

—খুব ভালো হবে দাদু—রাজু বলল, —আমি বড় হয়ে ওই স্কুলে পড়াব।

—এখন থেকে চাকরির ব্যবস্থা করছে, দেখেছ নারাণ, —ইন্দ্রনাথ মজা করে বললেন—কিন্তু স্কুল তৈরি করেও আরও অনেক টাকা থাকবে, তোমরা যদি অনুমতি দাও তাহলে সে টাকায় আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করি, কারণ টাকাটা তোমাদের, তোমরা ইচ্ছা না করলে হয় না।

—বারে, আপনি শুধু শুধু কীসব বলছেন, —নারাণ বলল—আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন।

—আমি একটা বড় হাসপাতাল করতে চাই—ব্যগ্র গলায় বললেন ইন্দ্রনাথ—রাজুর মা—আমার সোনার প্রতিমা বউমা বিনা চিকিৎসায় অকালে চলে গেছে, যার

জন্য আমার ছেলেও বিবাগী। যদি একটা ভালো হাসপাতাল থাকত তাহলে আমার সোনার সংসার এমন ছারখার হয়ে যেত না। এমন কত প্রাণ অকালে চলে যাচ্ছে!

—খুব ভালো হবে। স্কুল, হাসপাতাল—কত দূর দূর গ্রামের মানুষও আসবে এখানে—বলল নারাণ—তার চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল— খুব ভালো হবে।

রাজু অবাক হয়ে দেখছিল নারাণের মুখ, এ যেন এক অন্য নারাণ, আরও এক বিশাল ভালোবাসায় রাজুর বুক ভারী হয়ে উঠছিল।

—তবে এসব কথা ভুলেও কাউকে বলা চলবে না—ইন্দ্রনাথ চুপি চুপি বললেন—এমনকি রাজুর ঠাকুমাকেও নয়। কাল রাতেই সব শুনে আমি রাজুকে বারণ করেছি ওর ঠাকুমাকে না বলে। ছেলের সন্ধান পাওয়া গেছে জানলে অস্থির হয়ে পড়বে। যদিও সামান্য অনুমান মাত্র। ওই লোকটিকে যদি জিজ্ঞাসাও করা হতো হরিদ্বারের কোন আশ্রমে সে থাকত, তাহলেও না হয় কিছু কাজ হতো। তাছাড়া বাজে লোকে এসব জানলে ডাকাতি হতে পারে। আরও নানা উৎপাত— কত কিছু হতে পারে। আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে। আমাদের লক্ষ্য আমরা পূরণ করব। এসো আমরা তিনজনে ঈশ্বরের এই দান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করি।

তিনজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

১৮

দেখতে দেখতে পুজোর ছুটি এসে গেল। পুজোর ছুটিতে ইন্দ্রনাথ সপরিবারে হরিদ্বার যাবেন। সঙ্গে অবশ্য নারাণও যাবে। নারাণ এখন রোজ সন্ধ্যাবেলা ইন্দ্রনাথের কাছে পড়তে আসে। রাজু ও নারাণ দুজনকেই একসঙ্গে পড়ান তিনি। নারাণের বাবার কাছে অনুমতি নিয়েছেন নারানকে হরিদ্বার নিয়ে যাবার জন্য।

উমারানী খুব খুশি। জীবনে কবেই বা দূরে কোথায় বেড়াতে গেছেন! এ একেবারে এতদূর—হরিদ্বার!

কলকাতার এক বড় কোম্পানীকে স্কুল ও হাসপাতাল গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রনাথ যৌবনে যখন কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতেন তখনকার এক বন্ধুর যোগাযোগে এসব ব্যবস্থা করেছেন।

সিংহগড়ে জংলা জমিতেই এসব গড়ে উঠবে তার প্রস্তুতি চলছে। বড় বড় গাছপালা বাঁচিয়ে বাড়ি রাস্তা এসব তৈরি হবে। বড় বড় জাম জামরুল পেয়ারা— এসব পেড়ে নারাণের খাওয়া চাই তো! আসলে তা নয়, কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার জমিটা দেখে বলেছেন এমন সবুজ পরিবেশ ধ্বংস করা উচিত নয়, এসব যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে সব তৈরি করতে হবে, মাঝে থাকবে সুন্দর রাস্তা। আর ভাঙা প্রাসাদের সামনে ওই বিশাল দীঘি—ওটা সংস্কার করা হয়েছে। টলটল করছে বর্ষার জল। চারপাশের ঘাটগুলি বাঁধানোর কাজ চলছে।

সিংহগড়ের ভাঙা প্রাসাদটা 'হেরিটেজ বিল্ডিং' হিসাবে রক্ষিত হবে। তার জন্য কিছু সংস্কারের প্রয়োজন হবে। ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার চৌধুরী ওটার জন্য সরকারি সাহায্য আনার চেষ্টা করবেন বলেছেন। এ ব্যাপারেও তোড়জোড় শুরু করেছেন তিনি।

১৯

সদলবলে অবশেষে হরিদ্বার এসে পৌঁছলেন ইন্দ্রনাথ। দীর্ঘ রেলযাত্রা অবশ্য খুবই উপভোগ করেছে রাজু ও নারাণ। এত বড় বড় সব রেলস্টেশন, কত নদী, কত সেতু, কত অরণ্য পাহাড়— আর কত রকমের মানুষ! একসঙ্গে এত দেখা—দুজনে যেন আত্মসাৎ করে উঠতে পারছিল না।

হরিদ্বারে গঙ্গার ধারেই একটা হোটেলে ওঠা হলো। খরস্রোতা গঙ্গা দেখে দেখে আশা মেটে না! সকলেই খুব তৃপ্ত, শুধু ইন্দ্রনাথের মন অশান্ত অস্থির। সকাল থেকেই তিনি একা চলে যান গঙ্গার ঘাটে, শয়ে শয়ে লোকজন সাধু সন্ন্যাসী এখানে স্নান করতে আসে, তাঁর মনে হয় যেখানেই সে থাকুক অন্তত এ ঘাটে স্নান করতে আসে যদি! কিন্তু রোজই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়।

একদিন বাসে করে দেরাদুন মুসৌরী ঘুরে আসতে হলো, সকলের আনন্দ ধরে না! কিন্তু ইন্দ্রনাথ? প্রকৃতির এই বিশাল মুক্তমেলায় তিনি কিছুতেই আনন্দ কুড়িয়ে নিতে পারছেন না, বরং একটি একটি করে দিন যাচ্ছে আর তিনি আরও বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। আশ্রমগুলিতেও ঘোরেন, জিজ্ঞাসা করেন, কোনো আশা পান না।

অবশেষে একদিন—মনসা পাহাড়ে ওঠার জন্য রোপওয়েতে উঠেছেন চারজন। রাজু আর নারাণ ঝুঁকে দেখছে নিচের গাছপালা, পথ, বাড়ি— সহসা নারাণ চিৎকার করে উঠল—সনাতন, সনাতন দা, ওই রাস্তায় মনে হচ্ছে।

—কই কোথায়? —রাজু ব্যগ্র হয়ে বলল।

—ওই তো, ওই যে লোকটা, হাতে ব্যাগ।

হতেও পারে, নাও হতে পারে—সন্দিগ্ধভাবে বলল রাজু।

—সনাতন আবার কে? —জিজ্ঞাসা করলেন উমারানী।

—ও সে আছে একজন, নারাণের চেনা—বললেন ইন্দ্রনাথ।

হেঁটে হেঁটে বেড়ানোর কথা হলে উমারানী দলে নেই। তাঁর হাঁটুতে ব্যথা, একটু বেশি হাঁটলেই সে ব্যথা জানান দেয়। অতএব যখন আশ্রমে আশ্রমে খুঁজতে বেরোন ইন্দ্রনাথ রাজু নারাণ সঙ্গে থাকে, সুবিধাই হয়। পরের দিন ওরা তিনজন খুঁজে খুঁজে সেই রাস্তায় এসে পৌঁছাল সম্ভবত যেখানে সনাতনকে দেখা গিয়েছিল।

যেদিক সনাতন যাচ্ছিল রাস্তা ধরে সেদিকে অনেকটা গেল ওরা। হালকা ধরনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা একটা আশ্রমের পাশ দিয়ে চলে গেছে আরও ভেতরে। কাউকে দেখাও যাচ্ছে না যে জিজ্ঞাসা করবেন। অগত্যা আশ্রমেই ঢুকে পড়ল সকলে মিলে। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। একজন সাধুকে দেখা গেল বারান্দায় বসে বই পড়ছেন।

—সনাতন বোলকে কোই এখানে হ্যায়? —সাধ্যমত হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন ইন্দ্রনাথ।

—সনাতন? নেহি। —এটুকু বলেই সাধুবাবা পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করলেন।

হতাশ হয়ে বাইরে এলেন ইন্দ্রনাথ। রাস্তাটা ওদিকে আরও জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। দুটি বালককে সঙ্গে নিয়ে ওদিকে যেতে সাহস হলো না তাঁর। তাছাড়া অনির্দিষ্ট স্থানে কোথায়ই বা যাবেন! ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। ক্লান্ত তিনজন গঙ্গার ধারে বসলেন। কত মানুষ ফুল সাজানো ডালায় প্রদীপ ভাসাচ্ছে। মনোবাসনা জানিয়ে প্রদীপ ভাসালে নাকি বাসনা পূর্ণ হয়। এসব ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না।

—দাদু, আমি একটা প্রদীপ ভাসাবো? —রাজু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল।

না বলতে গিয়েও ইন্দ্রনাথ থমকে গেলেন, রাজুতো অনেক কিছুই পারল— তিনি ভাবলেন— এই বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে ভেবেই তিনি সার্থক পূর্বপুরুষের নামে নাম রেখেছেন ওর। ওর একান্ত ইচ্ছা হয়ত ওর বাবাকেও ফিরিয়ে আনতে পারবে!

—ভাসাও—মৃদুস্বরে বললেন ইন্দ্রনাথ, টাকা বার করে দিলেন।

দুটি বালক একত্রে ডালাটি ধরে ভাসাচ্ছে। প্রদীপের আলোয় কী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওদের মুখ। এই মুহূর্তে ওদের মনে একটি মাত্র সাধ— দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথের

বুকের মধ্যে কী এক আবেগ মথিত হয়ে উঠল। তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল, তিনিও মনে মনে প্রার্থনা করলেন হে ঈশ্বর আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও!

এই খরস্রোতা কিন্তু প্রকৃতির নদীখাত নয়। এটা মানুষের তৈরি। প্রকৃত গঙ্গার খাত আরও ওদিকে, তার ওপর ধাতুর তৈরি দীর্ঘ সেতু। ওখানে নদীর বিস্তার অনেকখানি। মাঝে মাঝে বালির চর। ওদিকে নদীর ধারে একদিন ওরা বেড়াতে গিয়েছিল। ওখানে নদীর ধারে বালির চরে নানা রঙের ছোট ছোট নুড়ি পাথর পাওয়া যায়। রাজু ও নারাণ অনেক কুড়িয়েছিল, কিন্তু মন ভরেনি, পরদিন আবার ওরা যাবার জন্য বায়না ধরল। দূরত্বটা খুব বেশি নয়, অতএব উমারানীও সঙ্গ নিলেন। তখন দুপুর সবে গড়িয়েছে। ওদিকের রাস্তায় অটো হাঁকছে হৃষিকেশ, লছমনঝোলা—

এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে লছমনঝোলা যাওয়া হয়নি। অথচ ওই সেতুর ছবি রাজুর খুবই পরিচিত।

—দাদু, লছমনঝোলা বুঝি অনেকদূর? —রাজু জিজ্ঞাসা করল।

জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মাত্র আধঘণ্টার মতো লাগে।

—সে কী! তবে আমরা যাইনি কেন? —রাজু অবাক হয়ে বলল।

—চল তবে যাওয়া যাক। —ইন্দ্রনাথ বললেন।

সেতুর অনেকটা আগেই অটোরিক্সা নামিয়ে দিল। হেঁটে যেতে হবে। এখানেও গঙ্গার ধারে ধারে অনেক বাড়ি। একটা নয়, আরেকটু দূরে একই রকম আরেকটা দোলনা ব্রীজ! এতদিনে রাজু জানল দুটো ব্রীজের কথা! একটার নাম রামঝুলা, আরেকটার নাম লছমনঝুলা!

সেতুর ওপর গিয়ে দাঁড়াল সবাই। সেতুর ওমুখে একটা লোক ছোট একটা তোলা উনুনের আঁচে পাঁপড় সেঁকে বিক্রি করছে। সেতুর মাঝখান থেকে নারাণ ওদিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল।

—ওদিকে কি দেখছিস, নিচে দেখ কেমন স্রোত! —রাজু বলল।

—সনাতন দা, ওই যে সনাতন দা বলতে বলতে ছুটল নারাণ। ওরা সকলে তাকাল। নারাণ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, একটা লোক পাঁপড় হাতে নিয়ে হঠাৎ

ছুটতে শুরু করল। ওপারের রাস্তা দিয়ে লোকটি ছুটছে, পিছনে নারাণ, মাঝে মাঝে লোকটা পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, আবার ছুটছে, নারাণও ছুটছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইতো সনাতনদা—বলতে বলতে রাজুও ছুটল। দেখাদেখি দ্রুতপদে ইন্দ্রনাথ—পিছনে উমারানী।

নারাণ ততক্ষণে ধরে ফেলেছে ওকে, জাপটে রেখেছে, পাঁপড়টা নিয়ে একহাতে উর্ধ্ববাহু হয়ে রয়েছে সনাতন, রাজু পৌঁছে পিছন থেকে জাপটে ধরল।

ইন্দ্রনাথ যখন ওদের কাছে পৌঁছলেন তখন সনাতন কাতর গলায় বলছে—আমাকে ছেড়ে দাও খোকাবাবুরা, আমাকে পুলিশে দিও না, —বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সনাতন।

—কেন, তোমাকে পুলিশে দেবে কেন? —ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

—ওই যে, আমি চুরি করেছিলাম যে—বলল সনাতন।

—কিন্তু তুমি তো ওটা ফেরত দিয়ে দিয়েছ।

—হ্যাঁ, আমি তো ওটা ফেরত দিয়ে দিয়েছি।

—তবে?

—হ্যাঁ, তাইত, তবে? —যেন নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করল সনাতন।

—কিন্তু তুমি আমাদের না বলে পালিয়ে এসেছ কেন—নারাণ বলল, জাপটে ধরেই আছে দুজনে।

—তোমাকে পুলিশেও দেওয়া হবে না, কিছু করাও হবে না, তুমি শুধু একজনের সন্ধান দেবে—ইন্দ্রনাথ বললেন—ওরা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছে, কিন্তু তুমি আবার ছুট লাগাবে না বলো?

—ঠিক আছে, আমি ছুট লাগাবো না—বলল সনাতন।

ওরা দুজন ওকে ছেড়ে দিয়ে দুপাশে দাঁড়াল।

হাত নামিয়ে সেঁকা পাঁপড়টা ঠিক আছে কি না দেখে নিল সনাতন, একটু ভেঙে মুখে দিলো, বললো—বল এবার কি বলতে হবে।

—ওই যে সন্ন্যিসি দাদা, যার কথা তুমি বলেছিলে, কোথায় থাকেন?

নারাণ জিজ্ঞাসা করল।

উমারানী এতক্ষণে পৌঁছলেন। কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তিনি। সকলের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চাইলেন।

—সন্ন্যিসি দাদা? তিনি তো আমাদের আশ্রমেই থাকেন।

—কোথায় তোমাদের আশ্রম? —কম্পিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ইন্দ্রনাথ।

—এই তো কাছেই।

—আমাদের তার কাছে নিয়ে চল।

নিভৃত নির্জন আশ্রম। ওদের দাঁড় করিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে এল সনাতন, বলল—না, দেখতে পাচ্ছি না, কোথাও হয়তো গেছে! আচ্ছা, আসুন বাবার কাছে, সামনের একটা ঘর দেখিয়ে বলল সে।

জটাজুটধারী এক সাধু মেঝেতে বসে কি যেন লিখছিলেন, ওদের দেখে মুখ তুলে তাকালেন।

—এনারা সন্ন্যিসিদাদাকে খুঁজছেন—বলল সনাতন।

—ওনার নাম কি নরেন? —জিজ্ঞাসা করলেন ইন্দ্রনাথ।

—হ্যাঁ, —মৃদু হেসে বললেন তিনি, একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন—আপনারা বোধহয় ওর বাবা মা?

উমারানী এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, আকুল গলায় বললেন—আমার নরেন কি এখানে থাকে?

—হ্যাঁ, মা, —বললেন সাধু—আপনার ছেলে এখানে থাকে। আমি ওকে অনেকবার বলেছি ফিরে যেতে, বলেছি তোর এখনও পিছুটান কাটেনি, সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য মন তৈরি হয়নি।

—ওকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন বাবা—কান্নাভেজা গলায় বললেন উমারানী।

—আমি ফিরিয়ে দেওয়ার কে মা? আমি তো তাড়িয়ে দিতে পারি না। মা এসেছে নিতে, এর চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে।

—আর এই ওর সন্তান বাবা, —রাজুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন উমারানী, জন্মের পর ওর মুখটাও দেখেনি।

—ও কিছুই ভুলতে পারেনি মা, আমি তো দেখেছি, গ্রামের গল্প, বাড়ির কথা এসব বলতে ও কী ভালোইবাসে। তাই তো বলি ফিরে যা। বসুন আপনারা, কোথাও গেছে, কিংবা হয়ত গঙ্গার ধারে কোথাও বসে আছে, সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। সনাতন, একটা সতরঞ্চি পেতে দে।

সকলে বসলেন।

তারপর, দরজায় এসে দাঁড়াল ও কে? উমারানী তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন কাছে।

—কে! —চমকে উঠল আগন্তুক।

—আমি, মা রে, তুই কত রোগা হয়ে গেছিস খোকা! —খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছেলের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন উমারানী, কান্নায় বুজে এল গলা।

—বোস্ নরেন, বোস্—বললেন সাধু—পালাবি কোথায়, এ মায়ার জগতে বাঁধন কেটে পালানো কি অত সোজা রে! বোস্, এখানে বোস্, এই তোর ছেলের পাশে—রাজুকে দেখিয়ে বললেন।

মাথা নিচু করে এসে বসল নরেন, রাজুর পাশে।

—রাখ্, ছেলের মাথায় হাতটা রাখ্।

রাজুর মাথায় কম্পিত হাত রাখল নরেন।

রাজু তাকিয়ে দেখল, মানুষটিকে ভালোই লাগল তার।

—আমি একটা হাইস্কুল আর একটা হাসপাতাল গড়ছি—ইন্দ্রনাথ বললেন শুনে নরেন চমকে তাকাল—হ্যাঁ, ক্রমশ সবই জানতে পারবে, নরেনকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি—কিন্তু এ বয়সে কত আর পরিশ্রম করতে পারব?

—বাঃ! বাঃ! খুব ভালো কথা। আর্তের সেবাই তো ঈশ্বরের সেবা। সেই যে বিবেকানন্দ বলেছেন—'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'—

যা যা, ফিরে যা, সেবার ব্রত নে, —স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন সাধু।

—সনাতন দাদাও যাবে—বলল নারাণ—স্কুলের দারোয়ান হবে, ঘন্টা বাজাবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, —ইন্দ্রনাথ বললেন—ও এখনও কিছুই জানে না, ওর থেকেই তো সব! ও না গেলে চলে!



সনাতন হতভম্ব! একবার এর মুখের দিকে, একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি বলবে কিছুই ঠিক করতে পারল না, বলল—আমি—আমি—কিন্তু

—চলনা বাবা, সকলে বলছে—স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন উমারাণী। চওড়া লালপাড় শাড়ী পরেছেন উমা, কপালে সিঁদুরের বড় টিপ, মাথায় অল্প ঘোমটা, তাঁর দিকে তাকিয়ে সনাতনের মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার সেই দৃশ্য—প্রদীপ

হাতে মা তুলসীতলায়, বুকটা কেমন করে উঠল। উনি কেমন 'বাবা' বললেন! সনাতনের মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করে। তার চোখ জল ছলছল। সাধুবাবার দিকে তাকাল একবার। এতদিনের আশ্রয়দাতা!

সাধু বাবা সব বুঝে ফেললেন, বললেন—যারে সনাতন, অমন মা পেলি, চলে যা।

একটু রসিকতার ছলে বললেন—আবার চাকরিও হয়ে গেল! অনেকদিন বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরছিস, এবার স্থিতু হ!

সনাতন প্রথমে ফুঁপিয়ে তারপর হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল।

সাধুবাবা বললেন—এ কী রে!

সনাতন হাসতে গিয়ে হাসি কান্না মিশিয়ে এক অপূর্ব খিচুড়ির স্বাদ অনুভব করল।